সারেক রকম

অষ্টম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা
১-১৫ মার্চ ২০২০ ১৬-৩০ ফাল্গুন ১৪২৬

মূল্য : ৩০ টাকা

আরেক রকম

পাক্ষিক পত্রিকা, মাসের ১লা ও ১৬ই প্রকাশিত
স্বত্বাধিকারী : সমাজ চর্চা ট্রাস্ট

সম্পাদক
শুভনীল চৌধুরী
subhanilc@gmail.com

সম্পাদকীয় দপ্তর
আরেক রকম
৩৯এ/১এ বোসপুকুর রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৪২
প্রতি সংখ্যা ৩০ টাকা
বার্ষিক সডাক ৭০০ টাকা
এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে 'সমাজ চর্চা ট্রাস্ট'-এর সদস্য হলে তাঁকে *আরেক রকম*-এর স্থায়ী গ্রাহক করে নেওয়া হবে।

arekrakam@gmail.com
samajcharcha@gmail.com

স্বত্বাধিকারী
সমাজ চর্চা ট্রাস্ট
কমার্শিয়াল কমপ্লেকস (চতুর্থ তল)
৮১/২/৭ ফিয়ার্স লেন
কলকাতা ৭০০ ০১২

গ্রাহক পরিষেবা
রবিন মজুমদার
৯৪৩২২১৯৪৪৬

আরেক রকম

অষ্টম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা ১-১৫ মার্চ ২০২০,
১৬-৩০ ফাল্গুন ১৪২৬
Vol. 8, Issue 5th, Arek Rakam RNI No. WBBEN/2013/49896

সূ ◆ চি ◆ প ◆ ত্র

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক: অশোক মিত্র

উপদেষ্টা: অমিয়কুমার বাগচী

সম্পাদক
শুভনীল চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলী
গৌরী চট্টোপাধ্যায়
কালীকৃষ্ণ গুহ
প্রণব বিশ্বাস
ইমানুল হক
শাক্যজিৎ ভট্টাচার্য
অমিতাভ রায়

প্রচ্ছদ
নামলিপি: হিরণ মিত্র
ছবি: তমালি দাশগুপ্ত
ভিতরের ছবি: সুরজিৎ সরকার

পরিবেশক
বিশাল বুক সেন্টার
৪ টোটি লেন, কলকাতা-৭০০ ০১৬
ফোন: ০৩৩-৪০৬৪-৪০৯৭, ৪১০৩, ৬৩৫৩

বাংলাদেশ পরিবেশক
পাঠক সমাবেশ
শাহবাগ, ঢাকা ১০০০

আরেক রকম পত্রিকার জন্য যোগাযোগ স্থল
শিলিগুড়ি: নন্দদুলাল দেবনাথ, ৯৪৭৪৩৮৩৪৪২
বোলপুর: সোমনাথ সমাদ্দার, ৯৪৭৫৩৬৩৩৫২

ওয়েব সাইট: www.arekrakam.com

প্রতি সংখ্যা ত্রিশ টাকা

বার্ষিক সডাক সাতশো টাকা

এককালীন ৫০০০.০০ টাকা দিয়ে 'সমাজ চর্চা ট্রাস্ট'-এর সদস্য হলে *আরেক রকম* আজীবন বিনামূল্যে পাওয়া যাবে।

সম্পাদকীয়
দিল্লিতে গুজরাট মডেল ৫
বিচারের বাণী ৮

সমসাময়িক
দিদির কীর্তি ১০
ওরা ধ্বংস করে ১১
জিও জিও only জিয়ো ১৩

চলে গেলেন শঙ্কর সেন
অমিতাভ রায় ১৫

ভাইরাস ভাবনা
মানসপ্রতিম দাস ২১

নভেল করোনা ভাইরাস— দু-চার কথা
ডা. কৃষ্ণেন্দু রায় ২৬

দিল্লির বিধানসভা ভোট
গৌতম হোড় ২৮

মা এবং ফাঁসি
প্রতিভা সরকার ৩২

অথ টোলরহস্যকথা ও একটি অমীমাংসিত প্রশ্ন—১
দেবোজ্যোতি গঙ্গোপাধ্যায় ৩৫

আমার কলকাতা
অশোককুমার মুখোপাধ্যায় ৪০

শিল্প ও সমালোচনা
বীরবল রায় ৪৫

আক্রান্ত ভারতীয় সংবিধানের বুনিয়াদ ধর্মনিরপেক্ষতা
অম্বিকেশ মহাপাত্র ৪৭

মহাত্মার দেখা পাওয়া
অভয় বাং ৪৯

চিঠির বাক্সো ৫৫

পুনঃপাঠ
সূর্য আমাদের প্রদক্ষিণ করতে বাধ্য?
অশোক মিত্র ৫৬

সমাজ চর্চা ট্রাস্ট-এর পক্ষে তৃষিতানন্দ রায় কর্তৃক ৩৯এ/১এ, বোসপুকুর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪২ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক এস. পি. কমিউনিকেশনস্ প্রা. লি., ৩১বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

Social Scientist

সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে তথ্যনির্ভর চিন্তাশীল প্রবন্ধসমষ্টি। বছরে ছ'টি সংখ্যা। কয়েক দশক ধরে প্রকাশিত হচ্ছে।

চাঁদার হার

এক বছর : ৩০০ টাকা

দুই বছর : ৫০০ টাকা

তিন বছর : ৬০০ টাকা

সম্পাদক

প্রভাত পট্টনায়ক

সম্পাদকমণ্ডলী

মধু প্রসাদ, উৎসা পট্টনায়ক, বি. রঘুনন্দন

সি. পি. চন্দ্রশেখর, জয়তী ঘোষ, বিশ্বময় পতি

সম্পাদকীয় দপ্তর

৩৫এ/১ শাহপুর জাট

নতুন দিল্লি ১১০০৪৯

আরেক রকম

সম্পাদকীয়

দিল্লিতে গুজরাট মডেল

দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে দেশের মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন গুজরাট মডেল গোটা দেশে তিনি চালু করবেন। অবশেষে তাঁর দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছে, গুজরাট মডেলের ২০২০ সালের সংস্করণ আমরা দিল্লিতে দেখতে পাচ্ছি। রাষ্ট্রের মদতে আরএসএস-বিজেপি কীভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের উপর হামলা করে প্রাণহানি ঘটাতে পারে তার প্রথম ল্যাবরেটরি ছিল গুজরাট। সেই মডেল উত্তরপ্রদেশে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উন্নত করার পরে প্রয়োগ করা হচ্ছে দেশের রাজধানী দিল্লিতে। এই সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লেখার সময় উত্তর-পূর্ব দিল্লির বিস্তীর্ণ এলাকায় দাঙ্গায় নিহত হয়েছেন ২০ জন (দিল্লি পুলিশের একজন হাবিলদারসহ), আহত ২৫০ জনের বেশি।

নাগরিক সংশোধনী আইন ২০১৯ সংসদে পাশ হওয়ার পর থেকেই গোটা দেশজুড়ে প্রতিবাদ আন্দোলন সংঘটিত হয়, যার সামনের সারিতে ছিল দিল্লির শাহিনবাগ আন্দোলন। ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেই শাহিনবাগকে ঘিরে ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক এবং উশকানিমূলক প্রচার চালায় অমিত শাহ, যোগী আদিত্যনাথ, অনুভব ঠাকুরের মতন বিজেপির প্রথম সারির নেতারা। সেই বলে বলীয়ান হয়ে গোটা দিল্লি শহরজুড়ে তীব্র সাম্প্রদায়িক প্রচার সংঘটিত করা হয়, হিন্দুত্ববাদী গুন্ডারা গুলি চালায় জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া এবং শাহিনবাগ আন্দোলনের উপর। কিন্তু সমস্ত ঘৃণা এবং হিংসার পরেও বিজেপি দিল্লির নির্বাচনে গো-হারা হারে। অতএব, তারা তাদের রণকৌশল পালটায়।

এই পরিবর্তিত রণকৌশল নতুন কিছু নয়। বহু বছর ধরে আরএসএস-বিজেপি যেই রণকৌশলটি তাদের সাম্প্রদায়িক এবং হিংসার রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করেছে তা হল দাঙ্গা এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের উপর সংগঠিত আক্রমণ। দিল্লিতে তাদের এই বহু পরীক্ষিত নীতিই প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেয় সংঘ পরিবার। ভূমিকা তাদের তৈরি ছিল। শাহিনবাগ আন্দোলনকে পাকিস্তানি ষড়যন্ত্র এবং দেশদ্রোহীদের আখড়া বলে প্রচার ছিলই। এবারে উত্তর-পূর্ব দিল্লির জাফরাবাদ অঞ্চলে শাহিনবাগের মতন একটি অবস্থান শুরু হতেই বিজেপি নেতা কপিল মিশ্র পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকের সামনে ঘোষণা করেন যে কোনো অবস্থান তাঁরা করতে

দেবেন না। পুলিশ যদি অবস্থানকারীদের না সরায় তা হলে তিনি এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা নিজেরাই রাস্তা খালি করে দেবেন।

এবং তাই হল। কপিল মিশ্রর হুমকি অনুযায়ী মাঠে নেমে পড়ল গেরুয়া বাহিনী। মুসলমানদের দোকান, ব্যাবসা নিশানা করে ভাঙচুর করা হল, আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। অসংখ্য ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে যেখানে দেখা যাচ্ছে মুসলিম মহল্লায় আগুন জ্বলছে, মুসলমান ব্যক্তিকে মাটিতে ফেলে পেটানো হচ্ছে, গুলি চালানো হচ্ছে, বাড়িতে আগুন ধরানো হচ্ছে ইত্যাদি। এমনকী সাংবাদিকদের ধর্মীয় পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। হিন্দু পরিচয় দিলে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলেন এনডিটিভির সাংবাদিক অরবিন্দ। আরো বহু সাংবাদিক প্রহৃত। হিন্দুত্ববাদী গুন্ডাদের দাপটে ছবি তোলা নিষেধ। কিছু ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব আইন বিরোধীদের তরফেও হিংসা হয়েছে বলে খবর এসেছে গণমাধ্যমে।

যে-ই হিংসা করে থাকুক প্রশাসন এবং পুলিশের কাজ তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া। এখানেই দিল্লি গুজরাট থেকে শিখেছে কীভাবে হিন্দুত্ববাদী দাঙ্গাবাজদের সাহায্য করতে হয়, কীভাবে দরকারে তাদের হয়ে দাঙ্গা করতে হয়। এই শিক্ষাও একদিনে হয়নি। যখন দিল্লিতে গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে, মুসলমান বালক জুনেইদের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লি পুলিশ কিছু করেনি। যখন জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে এক হিন্দুত্ববাদী যুবক গুলি চালিয়েছে দিল্লি পুলিশ তার পিছনে দাঁড়িয়ে মজা দেখেছে। যখন জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে আরএসএস-এভিবিপি'র গুন্ডারা প্রকাশ্য দিবালোকে ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষকদের উপর নৃশংস হামলা চালিয়েছে তখন দিল্লি পুলিশ হামলাকারীদের সসম্মানে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে বেরোতে সাহায্য করেছে, মামলা রুজু করেছে যাদের উপর হামলা হল তাদের বিরুদ্ধে, যদিও গুন্ডারা সসম্মানে ঘুরছে। কিছু ক্ষেত্রে আবার দিল্লি পুলিশ নিজেই হামলা করেছে, যেমন ঘটেছিল ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯ জামিয়া মিলিয়াতে। এই সমস্ত অনুশীলন করে বর্তমানে দিল্লি পুলিশ গুজরাট মডেলের শংসাপ্রাপ্ত পুলিশে উত্তীর্ণ হয়েছে।

অতএব, অমিত শাহের পুলিশ বিজেপি-র পেটোয়া গুন্ডার ভূমিকায় অবতীর্ণ। তারা হয় নির্বিকার চিত্তে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঙ্গা হতে দিয়েছে, অথবা দাঙ্গাকারীদের সঙ্গে সমন্বয়ে হামলা চালিয়েছে সংখ্যালঘু মানুষের উপর। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ভয়াবহ চিত্র বর্ণনা করলেই বোঝা যাবে দিল্লি পুলিশের সাম্প্রদায়িক হিংসাত্মক ভূমিকা। চার-পাঁচ জন মুসলমান যুবক আহত অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছেন। দেখা যাচ্ছে দিল্লি পুলিশের সেপাই তাদের লাঠি দিয়ে খোঁচা মেরে 'আজাদি চাই?' বলে মশকরা করছে, 'বন্দেমাতরম' এবং 'জনগণমন' গাইতে বলছে। আহত মুসলমান যুবকেরা শুয়ে শুয়েই গোঙানির সঙ্গে 'জনগণমন' গাইছেন। হায় আমাদের সংবিধান, হায় রবীন্দ্রনাথ, হায় আমাদের সভ্যতা! যেই গান গাইলে অনেকের চোখে আজও জল চলে আসে, সেই 'জনগণমন' এখন আমার দেশের মানুষকে লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেই স্লোগান 'বন্দেমাতরম' উচ্চারণ করে শত শত মানুষ শহিদ হয়েছেন, কারাবরণ করেছেন ব্রিটিশ আমলে আজ পুলিশের হাতে তার গরিমাও ভূলুণ্ঠিত। যেই পুলিশকে সংবিধান দায়িত্ব দিয়েছিল মানুষকে নিরাপত্তা দেওয়ার তাদের হাতেই আজ লাঞ্ছিত হচ্ছেন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ।

দিল্লি পুলিশ অমিত শাহের পাঠশালায় পাঠ নিয়ে আজ শাসক দলের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ। তাদের এই নির্লজ্জ ভূমিকা দেখে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি কেএম জোসেফ আদালতে বলেছেন পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা দেখে এবং দেশ তথা সুপ্রিম কোর্টের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে তিনি বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে পুলিশের স্বাতন্ত্র্য এবং দায়বদ্ধতার অভাব রয়েছে। বহু মানুষের মৃত্যুতে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং বলেন কেউ উশকানিমূলক হিংসাত্মক ভাষণ দিলে তাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা উচিত কারো নির্দেশের অপেক্ষা না করে। দিল্লি হাইকোর্টও দ্যর্থহীন ভাষায় দিল্লি পুলিশের নিন্দা করে উশকানিমূলক বক্তব্য যারা রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দিয়েছে।

দিল্লি পুলিশের এক হাবিলদারের মৃত্যু হয়েছে, আরেকজন আধিকারিকের অবস্থা সংকটজনক। খবর আসছে গুপ্তচর বিভাগের এক কর্মীর মৃত্যুর। এদের মৃত্যু বা আহত হওয়ার ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু টানা তিনদিন পুলিশ ও প্রশাসন কেন দাঙ্গা চলতে দিল, কেন কারফিউ জারি করা হল না, কেন পুলিশকে প্রত্যক্ষভাবে দাঙ্গায় অংশগ্রহণ করতে দেখা গেল, এই প্রশ্ন উঠবেই।

আমাদের রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু একবার বলেছিলেন সরকার না চাইলে দাঙ্গা হয় না। দিল্লিতে দাঙ্গা হয়েছে কারণ কেন্দ্রীয় সরকার তা হতে দিয়েছে। তাই তিনদিন ধরে কারফিউ জারি করা হয়নি, পুলিশ নিষ্ক্রিয় থেকেছে, প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা বিজেপি-র কোনো স্তরের নেতাই এই নরমেধ যজ্ঞের নিন্দা করেননি। বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি অধিকাংশ আসন যেই অঞ্চল থেকে জিতেছে সেখানেই দাঙ্গা সংগঠিত হয়েছে। গুজরাট দাঙ্গা হওয়ার সময় এই নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলেন, দাঙ্গা অধ্যুষিত অঞ্চলে সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে অনেক দেরি করেন যেই সুযোগে হিন্দুত্ববাদী গুন্ডারা মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ভয়াবহ দাঙ্গা সংগঠিত করে। দিল্লিতেও একই ছকে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে এবং সেনাবাহিনীকে দাঙ্গা চলতে থাকার তিনদিন পরেও মোতায়েন করা হয়নি। যদি ন্যূনতম লজ্জা কেন্দ্রীয় সরকারের থাকত তবে অমিত শাহ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিতেন। কিন্তু এদের লজ্জা-শরম কিছু আছে এমন দাবি অতি নিন্দুকেরাও কখনো করেনি।

বিজেপি-র আসল উদ্দেশ্য কী? মার্কিন রাষ্ট্রপতি শহরে থাকাকালীন এহেন দাঙ্গা হতে দেওয়া হল কেন? এইসব প্রশ্ন হাওয়ায় ভাসছে যদিও উত্তর খুব সহজ। নতুন নাগরিকত্ব আইন এবং এনআরসি-র বিরুদ্ধে যেই আন্দোলন গোটা দেশে চলছে তার তিনটি চরিত্র বিজেপি-র সাজানো বাগানে খ্যাপা ষাঁড় ছেড়ে দিয়েছে। প্রথমত, এই আন্দোলনে সম্প্রদায় নির্বিশেষে মানুষ সামিল হয়েছেন। দ্বিতীয়ত, এই আন্দোলন সম্পূর্ণ অহিংস থেকেছে এবং প্রতীকগুলি বিজেপি-র জাতীয়তাবাদের ফানুস ফুটো করে দিয়েছে। ভারতের জাতীয় পতাকা এবং সংবিধান হাতে নিয়ে, মহাত্মা গান্ধী এবং আম্বেদকরের ছবি বুকে নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার যেই নজির এই আন্দোলন কায়েম করেছে তাকে বিজেপি যতই বলুক না কেন পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র হিসেবে মানতে মানুষ নারাজ। তৃতীয়ত, মহিলাদের বিপুল অংশগ্রহণ। নরেন্দ্র মোদী তিন তালাক আইনকে কেন্দ্র করে মুসলমান মহিলাদের পরিত্রাতা বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন। সেই মুসলমান মহিলারা যখন হাজারে হাজারে নরেন্দ্র মোদী-অমিত শাহের তৈরি করা নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামছেন তখন বিজেপি-র অস্বস্তি হবে বই কী।

দাঙ্গা লাগিয়ে বিজেপি এই রাজনৈতিক আখ্যানকে পালটাতে চাইছে অন্তত দুইভাবে। এক, নাগরিকত্ব আইনের পক্ষে এবং বিপক্ষে নয়, বিজেপি আখ্যান ঘোরাতে চাইছে হিন্দু বনাম মুসলমানের দিকে। দাঙ্গা হলে সেই আখ্যান স্থাপিত হওয়াই স্বাভাবিক। হিন্দু বনাম মুসলমান প্রিজম দিয়ে যদি নাগরিকত্ব আইনকে দেখা যায় তা হলে মানুষের ঐক্যে ফাটল ধরবেই। জাতীয় পতাকা, সংবিধান-গান্ধি-আম্বেদকার-আজাদের সাহায্যে যেই ধর্মনিরপেক্ষ পরিচিতি এই আন্দোলন তৈরি করছিল তার মূলে আঘাত করা যাবে। দ্বিতীয়ত ভয়াবহ হিংসা শুরু হলেই মহিলারা সবার আগে জনপরিসর থেকে সরে দাঁড়াবেন নিজেদের সন্তানদের বাঁচাতে। মুসলমান মহিলাদের ভয় পাইয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া এই আক্রমণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

এই গোটা ঘটনায় ধর্মনিরপেক্ষ বিরোধী শিবিরের নিষ্ক্রিয়তা স্তম্ভিত করে দেয়। কংগ্রেস বা বাম নেতারা টুইট করছেন, কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি লিখছেন কিন্তু রাস্তায় মানুষকে সংগঠিত করতে দেখা গেল না। সবচেয়ে বেশি হতাশ করেছেন অরবিন্দ কেজরিবাল এবং তাঁর দল। এক মাসও হয়নি তাঁরা দিল্লি শহরে ৫৩ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। অথচ মুখ্যমন্ত্রীকে দেখা গেল না দাঙ্গা থামানোর জন্য কোনো কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে। রাজঘাটে গিয়ে ফোটো তুললে বা দিল্লির লেফটেনান্ট গভর্নরের বাড়িতে ধরনা দিলে যদি দাঙ্গা থামত তবে সাম্প্রদায়িকতাকে হারানো অতি সহজ হত। কেজরিবালের হাতে পুলিশ নেই। কিন্তু একটি পার্টি আছে, যাকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে রাখা হল যখন তাঁর শহরেই দাঙ্গা চলছে। আসলে আম আদমি পার্টির মতাদর্শ-উত্তর রাজনীতি সাম্প্রদায়িকতাকে কখনো পরাভূত করতে পারে না কারণ সাম্প্রদায়িকতার উৎস এক ঘৃণ্য হিন্দুত্ববাদী রাজনীতি। শুধুমাত্র জল ও বিজলি দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিষকে হারানো যায় না। কেজরিবাল হয়তো এখনও ভাবছেন উটপাখির মতন বালিতে মাথা গুঁজে দিন কাটিয়ে দিতে পারলে তিনি তাঁর মতাদর্শহীন রাজনীতিকে বাঁচাতে পারবেন। কিন্তু ঝড় থামলে তিনি দেখবেন তাঁর দলের কর্মী-সমর্থকরাও তাঁকে ছেড়ে সাম্প্রদায়িকতায় ভেসে গিয়েছে। মতাদর্শ-উত্তর রাজনীতি হিংস্র ফ্যাসিবাদকে ভোটে হারালেও সমাজে হারাতে পারে না। উন্নত প্রগতিশীল ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শই ফ্যাসিবাদকে হারাতে সক্ষম। দুঃখের হলেও মানতে হবে সেই মতাদর্শের সৈনিকরা বর্তমান ভারতে ম্রিয়মান। সুদিন আসবেই, তবে দেরি হবে।

বিচারের বাণী

চমকে উঠতে হয়। গায়ে চিমটি কেটে নিশ্চিত হতে হয় জেগে আছি না ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি। সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি একটি সভায় যা বললেন তারপরে এই অপার বিস্ময়ের ঘোরে চলে যাওয়া স্বাভাবিক। মাননীয় বিচারপতি বললেন দেশের প্রধানমন্ত্রী সমস্ত বিশ্বে প্রশংসা অর্জনকারী নেতা যাঁর বহুমুখী প্রতিভাকে ধন্যবাদ জানাতেই হয়! দেশের প্রধানমন্ত্রী নাকি বিশ্ব স্তরে ভাবেন আর স্থানীয় স্তরে কাজ করেন। দেশের একজন পদাসীন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি যদি প্রকাশ্যে প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করেন তবে দেশের সংবিধান দুর্বল হয়, সুপ্রিম কোর্টের গরিমায় আঘাত লাগে।

আমাদের দেশের সংবিধান জগতের প্রথম সারির সংবিধান হিসেবে পরিগণিত হওয়ার অন্যতম কারণ নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা স্থাপন করা। নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা মানে শুধু এই নয় যে মাননীয় বিচারপতিরা বাদী-বিবাদী পক্ষের বক্তব্য শুনে পক্ষপাতিত্ব বর্জন করে প্রমাণের ভিত্তিতে রায় দেবেন। নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থার মূলে রয়েছে সরকারের নিরিখে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা। বিচারব্যবস্থা যদি সরকার বা সরকার পরিচালনাকারী প্রধানমন্ত্রীর গুণগ্রাহী হয়ে ওঠে তবে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে, সরকারের আইনের বিরুদ্ধে মানুষ বিচার চাইতে কোথায় যাবেন? ভারতের বিচারব্যবস্থা দেশের মানুষের গৌরব। কিন্তু দুঃখের কথা হলেও আমাদের বলতেই হচ্ছে এহেন বয়ান সুপ্রিম কোর্টের নিরপেক্ষতা নিয়ে মানুষের মনে প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে।

তবে এই প্রশ্নের জন্ম শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করার পরেই হচ্ছে বললে সত্যের অপলাপ হবে। বিগত বেশ কিছু বছর ধরে সুপ্রিম কোর্টের অন্দরে, তার রায়ে এবং সুপ্রিম কোর্টের বাইরে এমন কিছু ঘটনা ঘটে গেছে যা দেখে মনে হচ্ছে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের যেই বিশ্বাসযোগ্যতা মানুষের মনে ছিল তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন চারজন বিচারপতি এক নজিরবিহীন সাংবাদিক সম্মেলন সংঘটিত করে প্রকাশ্যে বলেন যে সুপ্রিম কোর্ট ভালো নেই, গণতন্ত্র বাঁচানোর জন্য তাঁদের জনসমক্ষে এসে বক্তব্য রাখতে হচ্ছে। তারপরে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট নিয়ে যেই চিন্তা সেই চারজন বিচারপতি ব্যক্ত করেছিলেন তা যেন আরো বেশি প্রকট হচ্ছে।

দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, সেই চারজন বিচারপতির মধ্যে একজন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হয়ে অযোধ্যার রাম-জন্মভূমি-বাবরি-মসজিদ মামলার বিতর্কিত রায় দেন যার মধ্যে দিয়ে হিন্দুরা সেখানে মন্দির গড়ার ছাড়পত্র পায়। এই রায়ে বিচারপতিরা বারবার বলেছেন যে বাবরি মসজিদ একটি ৪৫০ বছরের পুরোনো স্থাপত্য যা মসজিদ হিসেবেই নির্মাণ করা হয়েছিল, এখানে রামের মূর্তি ১৯৪৯ সালে যেভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল তা বেআইনি এবং ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংস এক জঘন্য অপরাধ। তবু, যাঁরা এই অন্যায় কাজগুলি করেছিলেন সেই পক্ষকেই জমির স্বত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন মহামান্য বিচারপতিরা। এহেন সিদ্ধান্ত দেশের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তির ক্ষতি করেছে সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বাবরি মসজিদ মামলায় সুপ্রিম কোর্ট যেই তৎপরতা দেখিয়ে পরপর ৪০ দিন শুনানি করে নিষ্পত্তি করেছে, তার ছিটেফোঁটাও জম্মু ও কাশ্মীর বা নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি। ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে সংখ্যার জোরে জম্মু ও কাশ্মীরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল করে রাজ্যটিকে ভেঙে দুটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে রূপান্তরিত করে। একইসঙ্গে মোবাইল ও ইন্টারনেট পরিষেবা বাতিল করে কাশ্মীরের তিন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীসহ সমস্ত রাজনৈতিক নেতাকে বন্দি করে। স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারের এই স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বহু মানুষ সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট ৩৭০ ধারা বাতিলের সাংবিধানিক বৈধতা সংক্রান্ত মামলার শুনানি এখনও শুরু করেনি। কিছুদিন আগে তাঁরা রায় দেন যে কাশ্মীরে ইন্টারনেট পরিষেবা অনির্দিষ্টকালীন বন্ধ রাখা বা ১৪৪ ধারা সরকারের মর্জি মতন বলবৎ করা আইনসিদ্ধ নয়। দেরিতে হলেও সুপ্রিম কোর্ট অন্তত এই প্রশ্নে সদর্থক ভূমিকা পালন করে। কিন্তু habeus corpus মামলা, যেখানে মামলাকারী কোনো একজন ব্যক্তিকে আদালতের সমক্ষে আনার দাবি জানায়, নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট খুব বেশি পদক্ষেপ নেয়নি। আবার রাজনৈতিক বন্দীদের দীর্ঘদিন বিনা বিচারে আটক করে রাখার বিরুদ্ধেও সুপ্রিম কোর্ট

কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। তা হলে মানুষের মনে এই প্রশ্ন জাগা কি খুব অস্বাভাবিক যে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট যাঁর ভূমিকা দেশের সংবিধানকে বাঁচানো এবং তার ব্যাখ্যা করা, তাঁরা সেই সংবিধানিক কর্তব্য সঠিক পালন করছেন তো?

এই প্রশ্ন সাম্প্রতিক কিছু মামলায় আরো বেশি করে উঠছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে একগুচ্ছ মামলা হয়েছে, একদফা শুনানিও হয়েছে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি তার মধ্যেই বললেন যে নাগরিকত্ব আইন বিরোধী হিংসাত্মক প্রতিবাদ না থামলে তিনি এই মামলার শুনানি করবেন না। প্রতিবাদ হিংসাত্মক না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সেই হিংসার সঙ্গে নাগরিকত্ব আইন বিরোধী মামলার শুনানির কী সম্পর্ক থাকতে পারে? বরং সুপ্রিম কোর্টের উচিত দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি করে দেশের বহু মানুষের মধ্যে এই আইন নিয়ে যে সন্দেহ বা প্রশ্ন আছে তার নিরসন করা।

নাগরিকত্ব আইন বিরোধী আন্দোলনে পুলিশের তরফ থেকে প্রবল হিংসা ঘটানো হয়েছে। জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় বা গোটা উত্তরপ্রদেশে আমরা পুলিশি বর্বরতার একাধিক রূপ দেখেছি। শুধু উত্তরপ্রদেশেই পুলিশের গুলিতে ২০ জনের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী খোলাখুলি সাম্প্রদায়িক ও হিংসাত্মক বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু শাহিনবাগে আন্দোলনকারী মায়ের একটি চার মাসের শিশুর মৃত্যুর পরে সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে নোটিশ জারি করে বলেছেন শিশুদের প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত হতে।

একটি চারমাসের শিশুর শোকার্ত মৃত্যুতে সুপ্রিম কোর্ট উদ্বেলিত হচ্ছে দেখে একদিকে আমরা যেরকম ভরসা পাচ্ছি, অন্যদিকে মনের কোণ থেকে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে সেই সব মাদ্রাসার ছাত্রদের মুখ যাদের উপর উত্তরপ্রদেশ পুলিশ পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছে, মনে পড়ে যাচ্ছে সেই ছাত্রদের মুখ যাদের পাঠাগারে ঢুকে পুলিশ নির্দয়ভাবে কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়েছে, একজন ছাত্রকে মেরে অন্ধ করে দিয়েছে, মনে পড়ে যাচ্ছে সেইসব মায়েদের মুখ যাঁরা ছেলের গুলি খাওয়া শব কোলে নিয়ে বিহ্বল হয়ে বসে আছেন উত্তরপ্রদেশে, মনে পড়ছে শাহিনবাগের দাদিদের কথা যাঁরা সংবিধানকে পাহারা দিতে রাত জেগে আছেন। সুপ্রিম কোর্ট এই মানুষগুলির দুঃখে যন্ত্রণায় কেন শরিক নয়, কেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে উত্তরপ্রদেশ সরকার বা দিল্লি পুলিশের কাছে নোটিশ জারি করেনি, এই প্রশ্ন আমাদের থাকবে।

২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গার সময় ২৩ জন মুসলমান মানুষকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারে কিছু হিন্দুত্ববাদী পাষণ্ড। এদের মধ্যে ১৪ জনের বিরুদ্ধে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা হয়। সুপ্রিম কোর্ট জানুয়ারি মাসে এই ১৪ জনকে জামিনে মুক্তি দিয়েছে। শর্ত দুটি। এক, মধ্যপ্রদেশে থাকতে হবে, গুজরাট যাওয়া যাবে না; দুই, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক কাজের সঙ্গে তাদের যুক্ত থাকতে হবে। যেই অপরাধীদের বিরুদ্ধে ২৩ জন মুসলমান মানুষকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে, তাঁরা কেন জামিন পেয়ে আধ্যাত্মিক কাজে মনোনিবেশ করবেন এই প্রশ্নর উত্তর একমাত্র মাননীয় বিচারপতিরাই দিতে পারবেন। মাননীয় বিচারপতিদের আমরা মনে করাতে চাই যে সুধা ভরদ্বাজসহ বহু মানবাধিকার কর্মী এখনও জেলে পচছেন, যাঁদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু ছাড়া পেয়ে যাচ্ছেন প্রমাণিত সাম্প্রদায়িক ঘাতকেরা।

একথা অনস্বীকার্য আমাদের দেশের সুপ্রিম কোর্ট বহু বছর ধরে সংবিধান রক্ষা করে চলেছেন এবং নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন। কিন্তু সাম্প্রতিক অতীতে সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন রায়, ক্ষেত্রবিশেষে সক্রিয়তা এবং নিষ্ক্রিয়তা দেখে অনেক সংবিধান বিশেষজ্ঞের মনে প্রশ্ন উঠছে সুপ্রিম কোর্ট কি তাঁর ঐতিহাসিক সাংবিধানিক কোর্টের ভূমিকা পালন না করে সরকারের চাপে পড়ছেন? 'প্রশ্নগুলো সহজ আর উত্তরও তো জানা!'

সমসাময়িক

দিদির কীর্তি

ইতিহাস যেমন নির্মম, তেমনই রসিকও বটে। মাঝে মাঝেই তা এমন সমস্ত মুহূর্তের আমদানি করে যে অতীত অট্টহাস্য করে ওঠে। অতি সম্প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি উক্তি আবার প্রমাণ করে দিল যে নিষ্ঠুরতা, অসংবেদনশীলতা অথবা দায়িত্বজ্ঞানহীন রাজনীতির চৌকাঠ পেরিয়ে এসে তিনি এখন নিজের অতীতেরই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এবং প্রাণপণে তাকে অস্বীকার করতে চাইছেন। স্বাভাবিক। বঙ্গজননী হয়ে উঠবার প্রয়োজনীয় উপাদানই হল রঙ্গময় কৃতকর্মগুলিকে অস্বীকার করা, মুছে দেওয়া। তবে পরিহাস এই যে, তিনি যতই অস্বীকার করতে চাইছেন, ফেলে আসা দিন ততই পুনরুজ্জীবনপ্রাপ্ত হয়ে এগিয়ে আসছে তাঁর দিকে।

জওহরহাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সভানেত্রীর মাথায় আঘাতের ঘটনা নিয়ে সিপিএম রাজনীতি করছে বলে অভিযোগ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ঐশী ঘোষের নাম না করে মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ, 'মাথায় একটা বাড়ি পড়েছে, তাতেই এত কথা, এত রাজনীতি!' নিজের শহর দুর্গাপুরে মিছিল করার অনুমতি পাননি ঐশী ও তাঁর সতীর্থেরা। তাঁর সভা ছিল বলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট ক্যাম্পাসের দুই ফটক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের উপরে বিতর্কে অংশগ্রহণ করে বাম পরিষদীয় নেতা ঐশীকে বাধা দেওয়ার প্রসঙ্গ তোলেন। তখন মমতা ওই কথাটি বলেন। বাংলায় এখন যে-কোনো দল যেমন খুশি সভা-মিছিল করতে পারে এবং অন্য রাজ্যের তুলনায় এখানে গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত বলেও দাবি করেন তিনি।

১৬ আগস্ট, ১৯৯০। হাজরায় মিছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। হঠাৎ করেই সেখানে সটান মমতার উপর লাঠিসোটা নিয়ে চড়াও হয় কিছু দুষ্কৃতী। তাদের লাঠির ঘায়ে মাথা ফাটে তখনকার যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আহত হন আরো অনেকে। অভিযোগ ওঠে, হামলার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বালিগঞ্জ, মনোহরপুকুরের দাপুটে সিপিএম কর্মী লালু আলম। তোলপাড় ওঠে পশ্চিমবঙ্গে। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বিধানসভায় ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছিলেন, 'এত বড়ো সাহস পায় কোথা থেকে? কে এই লালু আলম? এক্ষুনি একে অ্যারেস্ট করুন'। লালু গ্রেপ্তার হয়ে বেশ কয়েক বছর জেলে কাটান। জেল থেকে সিপিআই(এম) থেকে বহিষ্কৃত হন লালু। এই ইতিহাস মোটামুটি সর্বজনবিদিত।

এবং সর্বজনবিদিত এটাও যে মমতা মাসের পর মাস তাঁর মাথা ফেটে যাওয়াকে ব্যবহার করে গিয়েছিলেন। কে ভুলতে পারে তাঁর মাথায় বহুকাল ধরে বেঁধে রাখা ব্যান্ডেজ? বস্তুত, মাথা ফাটার ক্ষত অতদিন থাকে কি না, সেটাও একটা প্রশ্ন বটে। কিন্তু সে প্রসঙ্গে আপাতত যাবার দরকার নেই। প্রশ্ন হল, যিনি নিজে মাথা ফাটার ঘটনাকে 'এনক্যাশ' করে সমস্তরকম রাজনৈতিক প্রচার নিজের দিকে টেনেছেন, তিনি যখন আজ ঐশী ঘোষের মাথা ফাটাকে ব্যঙ্গ করেন, তখন কি অতীত অট্টহাস্য করে না? প্রসঙ্গত, ১৯৯০ সালের সেই ঘটনার মূল অভিযুক্ত লালু আলম আজ তৃণমূল কংগ্রেস করেন। কোন রসায়নে এর পরেও মুখ্যমন্ত্রী ঐশী ঘোষকে কটাক্ষ করেন, সেই বিতর্কে আমরা যাব না।

আমরা বরং দেখে নিই মমতার দ্বিতীয় মন্তব্য। বিধানসভায় ভাষণের সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে মন্তব্য করা হয়েছিল যে তিনি বিধানসভা ভাঙচুর করছিলেন। এতে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলেন, বিধানসভা ভাঙচুরের ভিডিও আছে, তাতে দেখাতে পারবেন কেউ, যে তিনি (মমতা) বিধানসভা ভাঙচুর করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেছিলেন, যখন বলেছেন তখন প্রমাণ করতে হবে। স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন যখন ওঁরা অভিযোগ করছেন, তখন প্রমাণ করতে হবে। অভিযোগ করেছেন, সিঙ্গুরে তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। সেই সময় বিরোধী দলনেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি দেখা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে নাকি বিধানসভাতেও ঢুকতে দেওয়া হয়নি। জুতো পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তিনি কিছুই করেননি দাবি করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভার কোনো জিনিসে পর্যন্ত হাত দেননি, দাবি করেছেন তিনি।

অবশ্য এই মিথ্যের হাঁড়িটি বাম বিধায়করাই ভেঙে দিয়েছেন। তাঁরা ভিডিও ফুটেজে দেখিয়েছেন, যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বর্তমানের বেশ কয়েকজন মন্ত্রীকে বিধানসভা ভাঙচুরের অ্যাকশনেও দেখা যাচ্ছে। যিনি বিধানসভা ভাঙচুরের সময়ে পুরো সময়টা সেখানে উপস্থিত থাকলেন, যাঁর প্ররোচনায় পুরোটা ঘটল এবং যিনি একবারও নিজের দলের বিধায়কদের এই কীর্তিকে এতদিনেও নিন্দা করেননি, তাঁর কাঁধ থেকে কি দায় ঝেড়ে ফেলা এতই সহজ হবে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বাভাবিকভাবেই চাইছেন ইতিহাস মুছে ফেলতে। হয়তো তাঁর বক্তব্যই বারবার বলে যাবেন, কারণ গোয়েবলস সাহেব বলেই গিয়েছেন যে একটা মিথ্যে বারবার বলতে বলতে সত্যি হয়ে ওঠে। কিন্তু তার পরেও মানুষের বেয়াড়া স্মৃতিটুকু থেকেই যায়। হয়তো মমতা ভয় পান সেই স্মৃতিকেই। প্রসঙ্গত, জরুরি অবস্থার সময়ে জয়প্রকাশ নারায়ণের জিপের উপর উঠে তাঁর নাচকেও অস্বীকার করবার একটা প্রয়াস সাম্প্রতিক কালে দেখা যাচ্ছিল। বলা হচ্ছিল যে সেই মেয়েটি নাকি মমতা ছিলেন না। যদিও প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য আলাদা। মানে, ট্রেন্ড সর্বত্রই পরিষ্কার। অতীতের কুকাজের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে চাইছেন তিনি। দুঃখের কথা, নিজের স্বচ্ছ এবং সৎ মুখোশটিকে যতবার টেনে আনছেন মুখের উপর, ততবারই স্মৃতি নামক একটি দমকা হাওয়া এসে এলোমেলো করে দিচ্ছে তাঁর সেই প্রয়াস।

তবে মমতার তৃতীয় কাজটি অতটা কৌতুকবহ নয়, বরং বিপজ্জনক। প্রয়াত সাংসদ তাপস পালকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষ বিদায় জানিয়েছেন তিনি, এবং অভিযোগ করেছেন যে তাপসের মৃত্যুর পিছনে বিজেপিই দায়ী। তার মানে, এখন থেকে চিটফান্ডের টাকা খাওয়া, সারদা রোজভ্যালির পাঁক গায়ে মাখা জেলফেরত অপরাধীদের এভাবেই শুদ্ধিকরণ করে নেওয়া হবে? রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অন্ত্যেষ্টির মাধ্যমে? বিজেপি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার খেলা খেলছে তা সর্বজনবিদিত। কিন্তু সেই শাক দিয়ে কি গরিব মানুষের কয়েক হাজার কোটি টাকা পকেটস্থ করবার অত বড়ো কাতলা মাছটাকে ঢেকে ফেলা যাবে? নাকি মুছে ফেলা যাবে তাপস পালের অপরাধ? তাঁর সেই ধর্ষণের হুমকি? এরকম এক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিতে যেরকম নির্লজ্জতার দরকার হয়, তা শেষ দেখা গিয়েছিল বালাসাহেব ঠাকরের মৃত্যুর পর তাঁর পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদার অন্ত্যেষ্টির সময়ে। দাঙ্গায় অভিযুক্ত এক ব্যক্তিকে এরকম সম্মান দেওয়া নিয়ে অভিযোগে উত্তাল হয়েছিল দেশ। তাপস পাল অত গুরুত্বপূর্ণ কেউ নন। কিন্তু এখানেও সেই বেইমান স্মৃতির প্রসঙ্গই ফিরে ফিরে আসে। মানুষ কি এসব দেখে ভুলে যাবে তাপস পালের অতীত? মমতা কি মানুষকে এতই বোকা ভাবেন?

একটা কথা স্পষ্টভাবে বুঝে নিন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বৈরাচারের চরিত্র গুণগতভাবে কংগ্রেস বা বিজেপির থেকে কোনো অংশেই আলাদা নয়। আর তাই বিজেপির বিরুদ্ধে মমতা কোনোমতেই নির্ভরযোগ্য শক্তি হতে পারেন না, কারণ তাঁর সুবিধাবাদ আর অতীত ইতিহাস বারেবারেই সময়মতো তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে শিখিয়েছে। আর আজ বিজেপি-র বিরুদ্ধে লড়ছেন বলে একটা প্রচার তোলা হয়েছে মিডিয়াতে, গণমহলে। কিন্তু এর ফলে তাঁর অতীত পাপ শুদ্ধ হয়ে যায় না কিছুতেই। মুছে যায় না সারদা নারদার কেলেঙ্কারি, অথবা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির উপর নামিয়ে আনা প্রবল সন্ত্রাসের ইতিহাস। বিজেপি-র জুজু মমতা দেখাচ্ছেন, ভালো কথা। আর বিজেপি-র বিপদকে অস্বীকার করবার জায়গাতেও আমরা নেই। তবে একথাও আমরা ভুলতে পারি না যে মাননীয়া পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মূলধারার রাজনৈতিক ব্যক্তি যিনি বিজেপি-র সঙ্গে জোট করেছেন, গুজরাত দাঙ্গার পরেও নরেন্দ্র মোদীকে পুষ্পস্তবক পাঠিয়েছেন। বলা যেতে পারে বিজেপি-র ভিত্তিপ্রস্তর পশ্চিমবঙ্গে স্থাপন করেছিলেন স্বয়ং তিনিই। তাই আজ, নিজের কৃতকর্মটুকু যদি মমতা স্বীকার করেন, সৎভাবে আত্মানুসন্ধানে নামেন, তাতে তাঁর নিজের, তাঁর দলের এবং রাজ্যের, সবারই মঙ্গল। কিন্তু তার জন্য অতীতকে অস্বীকার করলে চলবে না। তার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। সেই সাহস তিনি দেখাবেন না কারণ তাঁর অভিধানে তিনি কখনো ভুল করতে পারেন না। ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বৈরতন্ত্রের রাজনৈতিক ভাষ্যে নেতার কোনো দোষ থাকে না। অতএব সর্বত্র নন্দ ঘোষ খোঁজার বৃথা চেষ্টা।

ওরা ধ্বংস করে

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন...।' আর এখনকার পশ্চিম বাংলার মানুষের নজরে আসছে একই পথে তাঁরা তিনজন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি, ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী একই পথের পথিক। পাঁচিল গড়া, রেলিং লাগানো ইত্যাদি তাঁদের প্রশাসনের প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

একজন দেশের সীমানায় পাঁচিল গাঁথার কাজকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে নির্বাচনি ইসতেহারে ঘোষণা করেছিলেন রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর পূর্ণ উদ্যমে সেই কাজে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন। দেশের সংসদ পাঁচিল গড়ার কাজে বাজেট বরাদ্দ করতে সম্মতি না দেওয়ায় তিনি রীতিবিরুদ্ধভাবে রাষ্ট্রপতির ভেটো প্রয়োগ করতেও দ্বিধা করেননি। অতিথি আপ্যায়নের

কোনোরকম ঘাটতি যেন না হয় এই কথা মাথায় রেখে ভারতের প্রশাসনিক প্রধানের উদ্যোগে আহমেদাবাদ শহরের রাজপথের পাশে অবস্থিত বস্তি এলাকাকে দৃষ্টির বাইরে রাখার জন্য গাঁথা হয়েছে সুদীর্ঘ প্রাচীর। টাকার অভাবে কাজে যেন কোনো খামতি না থাকে। উদয়য়াস্ত কাজ করে সময়ের আগেই কাজ শেষ করার হুকুমনামা জারি হয়েছে। কোত্থেকে টাকা আসছে প্রশ্ন করলে প্রশাসন নিরুত্তর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি আহমেদাবাদে মাত্র তিন ঘণ্টা ছিলেন। শোনা যাচ্ছে যে এই তিন ঘণ্টার জন্য একশো কোটি টাকারও বেশি খরচ হয়ে গেছে। নিয়মের বাইরে গিয়ে সরকারি কোষাগারের টাকা অতিথি আপ্যায়নের জন্য খরচ করতে ভারত সরকারের উৎসাহ চোখে পড়ার মতো। গুজরাটের রাজ্য সরকার এবং স্থানীয় পুরসভার পরিচালনায় প্রধানমন্ত্রীর দল নিযুক্ত রয়েছে বলে নিয়মকানুনকে তোয়াক্কা না করে কাজ হয়েছে। এমনকী মূল অনুষ্ঠানের ধারেকাছে বিশ-পঁচিশ বছর ধরে বসবাসরত প্রায় পঞ্চাশটি বস্তিবাসী পরিবারের উচ্ছেদের বন্দোবস্ত করতেও দ্বিধা করেনি পুরসভা-রাজ্য-কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন গৈরিক শিবির।

একই ঘটনা গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিম বাংলায়ও ঘটে চলেছে। রাজ্য সরকারের আমন্ত্রণে দেশ-বিদেশের অভ্যাগতদের কলকাতায় আসার কোনো কর্মসূচি থাকলেই বিমানবন্দর থেকে শহরে আসার রাস্তার পাশে যেখানে যেখানে দৃশ্যদূষণের উপযোগী খাল, কচুরিপানা, টালির চালের বস্তি রয়েছে সেখানে বসিয়ে দেওয়া হয় চিত্র-উদ্ধৃতি সমৃদ্ধ সাময়িক রেলিং। বিশ্ব যুব ফুটবল হোক বা নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপন ঘরে ফেরার ঘটনা যাই হোক না কেন তাঁর অনুপ্রেরণায় ঢাকা দিয়ে দেওয়া হয় কঠিন বাস্তব। দিল্লির রণজিৎ সিং ফ্লাই ওভারের রেলিং-এর ওপর চড়িয়ে দেওয়া হয়েছে দুমানুষ উঁচু নিরাপত্তার বর্ম। ফ্লাই ওভারের নীচ দিয়ে বহে যাওয়া দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গের উপর গড়ে তোলা হয়েছে গেরুয়া শিবিরের সদর দপ্তর। বহুতল বিশিষ্ট এই মহার্ঘ প্রাসাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র এই মহান দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছে। বিদ্যাসাগর সেতুর ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। হাওড়া থেকে কলকাতার দিকে আসার সময় সেতুর যে অংশটুকু রাজ্য প্রশাসনের সদর দপ্তরের পাশে আছে সেখানে চড়িয়ে দেওয়া হয়েছে দুর্ভেদ্য নিরাপত্তা বর্ম। সবমিলিয়ে রাজকোষের অর্থে তাঁরা গড়ে তুলছেন প্রাচীর যা বাস্তবে বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার প্রতীক হিসেবে প্রতিপন্ন হচ্ছে।

পাশাপাশি চলছে নিরবিচ্ছিন্ন ধ্বংসলীলা। মধ্য প্রাচ্যের ঐতিহ্যবাহী শহর-নগরে ধারাবাহিকভাবে চলছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধ্বংসাত্মক আক্রমণ। সেখানকার প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনসমূহের সম্পূর্ণ বিলুপ্তির জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সতত সক্রিয়। প্রতিনিয়ত সেই উদ্যোগের কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে উচ্চারণ করতে এতটুকু সংকোচ বোধ করেন না। বাগদাদ, দামাস্কাস ইত্যাদি প্রাচীন শহরগুলিকে সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ না করা পর্যন্ত মার্কিন আক্রমণ বন্ধ করার কোনো সম্ভাবনা নজরে আসছে কি? তালিবান ধ্বংসের নামে আফগানিস্তানের হাড্ডা শহরকে গুঁড়িয়ে দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ন্যাটো সামরিক বাহিনী। আফগানিস্তানের পূর্ব সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ শহর জালালাবাদের দশ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত হাড্ডা খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে বৌদ্ধ শিক্ষা-সংস্কৃতির অন্যতম উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। এইরকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই। দুই আমেরিকা মহাদেশেই উপনিবেশবাদের দাপটে হারিয়ে গেছে সেখানকার প্রাচীন সভ্যতার যাবতীয় নিদর্শন-তথ্য। দুই আমেরিকার আদি বাসিন্দারা অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জঙ্গল-মরুভূমি-পার্বত্যাঞ্চলে প্রান্তবাসী হয়ে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছে। রচিত হয়েছে ঔপনিবেশিকদের আধিপত্যের ইতিহাস। আগামী দিনের ইতিহাসে হয়তো মধ্যপ্রাচ্যের সুপ্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন-তথ্য মুছে দিয়ে লেখা হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোথাও সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল না।

ভারতের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী সেই পথের অনুসারী। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোর বিরাষ্ট্রীয়করণ করে অর্থব্যবস্থার সর্বনাশ করেও ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকর্মাদি সমাপ্ত হয়নি। বিংশ শতাব্দীতে গড়ে ওঠা নতুন দিল্লির যাবতীয় সরকারি ভবন-স্থাপত্য ভেঙে ফেলে নতুন অট্টালিকা নির্মাণের নীল নকশা প্রণয়ন করা হয়ে গেছে। সংসদ ভবন, নর্থ এবং সাউথ ব্লক বাতিল করে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। নতুন নকশায় রাষ্ট্রপতি ভবনও ছাড় পাবে না। আগামী দিনে হয়তো বলা হবে যে গৈরিক শাসনাধীন ভারতবর্ষেই গড়ে উঠেছে নতুন দিল্লি।

পশ্চিম বাংলায়ও একই ঘটনা ঘটে চলেছে। ২০১৩-র ৫ অক্টোবর থেকে রাজ্য প্রশাসনের সদর দপ্তর নবান্ন। এই বহুতল বাড়িটি হুগলি নদীর পশ্চিম পারে হাওড়া শহরে অবস্থিত। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী প্রশাসনের সদর দপ্তর যেখানে অবস্থান করে তাকেই রাজ্য বা দেশের রাজধানী বলা হয়। সেই কারণেই বাংলার ইতিহাসে দেখা যায় কখনো রাজধানীর নাম কর্ণসুবর্ণ কখনো বা গৌড়। প্রশাসনের স্থান বদলের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার রাজধানীর পরিবর্তন হয়েছে। মুর্শিদাবাদ, ঢাকা এবং সবশেষে কলকাতা এই নিয়মেই বিভিন্ন সময় বাংলার রাজধানী হয়েছে। আগামী দিনে হাওড়াকে রাজ্যের রাজধানী বললে আপত্তি করা যাবে কি? এখানেই শেষ নয়। ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই গত নয়-দশ বছরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিয়মিতভাবে সরকারের প্রতিটি বাড়ি-সেতু-হাসপাতাল-প্রেক্ষাগৃহে নিজের নাম উৎকীর্ণ করে চলেছেন। ভাবখানা এমন যে তাঁর হাতের ছোঁয়ায় এইসব ইমারত নির্মিত হয়েছে। নতুন করে ইতিহাস নির্মাণের উদ্যোগ। সবমিলিয়ে বলা যায় তাঁরা তিনজন যেন ইতিহাস পরিবর্তনের

লক্ষে এগিয়ে যেতে চাইছেন। এই পটভূমিতে অনেকেরই উনিশশো সত্তরের দশকের একটি জনপ্রিয় নাটকের কথা মনে পড়ে যেতে পারে। 'অগ্নিবিষয়ক সতর্কতা এবং গৌতম'। জার্মান নাট্যকার ম্যাক্স ফ্রিস্ক রচিত একটি রেডিয়ো-নাটকের অনুসরণে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নাটকটি রচনা করেন। তাঁর নির্দেশনায় মঞ্চস্থ নাটকটি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। সেই সূত্রেই বলা যায় আগামী দিনে হয়তো উচ্চারিত হবে,-ধ্বংসবিষয়ক সতর্কতা এবং জনগণ।

জিও জিও only জিয়ো

এক জাতি, এক ভাষা, এক ধর্ম, এক রাষ্ট্র। দেশজুড়ে সদর্পে বহে চলেছে একীকরণের জোয়ার। একীভূত ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই কি একটি নির্দিষ্ট সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে ভারতের টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থা?

অথচ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর সংস্কার করার নামে ১৯৯০-এর দশকে মুক্ত বাজার প্রবর্তনের লগ্নে সম্পূর্ণ অন্য সুরে বিশ্বায়নের বন্দনা করা হয়েছিল। খোলা বাজারে খোলা হাওয়া বইতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই ১৯৯২-তেই সেলুলার ফোনের লাইসেন্স বিক্রির জন্য নিলামের বন্দোবস্ত হল। দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাই আর কলকাতার জন্য আটটি টেলি-সংস্থাকে বেছে নিয়ে প্রতিটি মহানগরীর দায়িত্ব দুটি সংস্থার হাতে তুলে দিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল টেলি যোগাযোগ মন্ত্রণালয় তথা ভারত সরকার। বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে শুরু করে সমস্ত আন্তর্জাতিক ঋণ প্রদানকারী সংস্থার তারিফ জুটল। ইয়োরোপ, আমেরিকার অর্থনৈতিক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হল উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় সম্পৃক্ত অসংখ্য প্রবন্ধ।

টেলি যোগাযোগ মন্ত্রণালয় বা ডট-এর যুগান্তকারী সিদ্ধান্তকে সাদরে বরণ করে নিল দেশের শিল্প-বাণিজ্য মহল। মধ্যবিত্তও বাদ যায়নি। এমনকী যাদের বাড়ির কোনো সদস্য টেলিফোন বিভাগে কর্মরত তারাও চিবিয়ে চিবিয়ে মন্তব্য করল, এতদিনে একটা কাজের কাজ হয়েছে। একটা টেলিফোন পাওয়ার জন্য আর একে তাকে ধরাধরি করতে হবে না। টেলিফোনের লাইন বিগড়ে গেলে বাবুদের হাতে পায়ে ধরতে হবে না। টেলিফোন দপ্তরে ছোটাছুটি এইবার বন্ধ হবে।

তবে সকলেই ভুলে গেল যে দেশের নাম ভারতবর্ষ। এখানে রাতারাতি নতুন কিছু চালু করা প্রায় অসম্ভব। কাজেই ডট লাইসেন্স দেওয়ার পরই শুরু হয়ে গেল আইন-আদালত। প্রকাশিত হল জাতীয় টেলিকম নীতি বা এনটিপি। অবশেষে সবরকমের জটিলতার ফাঁস থেকে মুক্তি পাওয়ার পর ১৯৯৫-এর ৩১ জুলাই কেন্দ্রীয় টেলি-যোগাযোগ মন্ত্রী পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে প্রথম মোবাইল ফোনে করলেন বাক্যালাপ। দেশের টেলিফোন ব্যবস্থায় সে এক উজ্জ্বল মুহূর্ত।

সূচনা লগ্নে চার মহানগরীর জন্য চাররকমের লাইসেন্স ফি ধার্য করা হয়েছিল। মুম্বাইয়ের জন্য বছরে ৩ কোটি টাকা। দিল্লির জন্য ২, চেন্নাই-এর জন্য দেড় আর কলকাতার জন্য বছরে এক কোটি টাকা। প্রতি বছর লাইসেন্স ফি সংশোধনের কথা এনটিপি-তে প্রথমেই বলা হয়েছিল বলে টেলি-শিল্পের নতুন উদ্যোগীরা বছর বছর বাড়তি লাইসেন্স ফি দিতে আপত্তি জানানোর সুযোগ পায়নি। প্রতি বছর তো দূরের কথা তখন প্রতি দিনই লাফিয়ে লাফিয়ে তাদের ব্যাবসা বাড়তে থাকায় বাড়তি লাইসেন্স ফি নিয়মিত জমা দেওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়ার সময় হয়নি। সরকারও বোধহয় অনুমান করতে পারেনি যে নতুন এই যোগাযোগ ব্যবস্থা থেকে কত রাজস্ব আদায় করা যায়। ততদিনে গঠিত হয়েছে ভারতীয় টেলিকম নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ সংক্ষেপে ট্রাই। নানারকম জটিল অঙ্ক কষে টেলি-শিল্পের বিপুল মুনাফা থেকে রাজস্ব আদায়ের বিধি তৈরি করল ট্রাই। ২০০৩ নাগাদ ট্রাই নির্ধারিত বিধি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পেয়ে গেল। আর গঠিত হল নতুন এক বিচার-বিবেচনা মঞ্চ, টেলিকম ডিসপুটস সেটেলমেন্ট আপেলেট ট্রাইব্যুনাল সংক্ষেপে টিআইডিস্যাট।

টেলিকম নীতি, আইনি রক্ষাকবচ, নিত্য নতুন গ্রাহক ইত্যাদি নিয়ে সবমিলিয়ে নবীন পরিষেবা শিল্পের তখন বেশ রমরমা ব্যাবসা। ছোটো, বড়ো, মাঝারি মানের নতুন নতুন পরিষেবা সংস্থার আগমন ঘটছে। দেশি বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছে। হাতের মুঠোয় যোগাযোগ ব্যবস্থা এসে যাওয়ায় শহর-গ্রাম, মফস্বল-মহানগর এককথায় তামাম ভারতবর্ষের গ্রাহক খুশি। এই আবহে ২০১২-য় প্রকাশিত হয় ২জি কেলেঙ্কারির খবর। সুপ্রিম কোর্টের দ্রুত হস্তক্ষেপের ফলে এক ধাক্কায় বাতিল হয়ে গেল ১২২টি টেলিকম লাইসেন্স। টেলিনর, এটিলস্যাট, সিস্টিমা, বাহরিন টেলিকম, ম্যাক্সিস ইত্যাদি আন্তর্জাতিক স্তরের ডাকসাইটে সংস্থার লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাওয়ার পর টেলিকম শিল্প বড়ো রকমের ধাক্কা খেল। ছোটো ও মাঝারি আকারের উদ্যোগীরা পাততাড়ি গুটিয়ে নিতে বাধ্য হল। হাতে গোনা কয়েকটি বড়ো সংস্থার মধ্যে চলেছে প্রতিযোগিতা। মাশুল নির্ধারণের বিষয়ে ট্রাই তখন নীরব।

২০১৪-য় নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর উচ্চকিত

স্বরে জানানো হল যে ৩জি স্পেকট্রাম নিলাম করা হবে। এর ফলে স্পেকট্রাম বণ্টন ব্যবস্থা স্বচ্ছ হবে। সরকারের ঘরে একসঙ্গে অনেক টাকাও আসবে। যে কয়েকটি পরিষেবা সংস্থা বাজারে টিকেছিল তারা তখনও কিছু আন্দাজ করতে পারেনি। ২০১৬-র সেপ্টেম্বরে রিলায়ান্স জিয়ো পরিষেবা ব্যবস্থা হইহই করে টেলিকম বাজারে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই পরিস্থিতি একেবারেই বদলে গেল। ২জি বা ৩জি নয় সরাসরি ৪জি স্প্রেকট্রাম নিয়ে তাদের আগমন। গ্রাহক পেয়ে গেল নিখরচায় কথা বলা, ছবি তোলা, গান শোনা, সিনেমা দেখার সুযোগ। মোবাইল ফোনের ব্যবহার দ্রুত বেড়ে চলল। মাশুল নিয়ে ট্রাই কোনো কথা না বলার সিদ্ধান্ত আগেই নিয়েছিল। টিআইডিস্যাটও নীরব। ছোটোরা তো আগেই বিদায় নিয়েছে। টিকে থাকার চেষ্টায় বড়ো সংস্থাগুলো নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে প্রয়োজনে সংযুক্তিকরণ করে অসম লড়াইয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করল। ভোডাফোন এবং আইডিয়া মিলেমিশে হয়ে গেল ভোডাফোন-আইডিয়া। সরকারের বিএসএনএল এবং এমটিএনএল প্রতিযোগিতায় অনুপস্থিত। দেশজোড়া পরিকাঠামো থাকা সত্ত্বেও পরিষেবার মান উন্নত করতে আদৌ উৎসাহী নয়। রিলায়্যান্স জিয়ো ছাড়া অন্য দুই প্রধান পরিষেবা প্রদানকারী এয়ারটেল এবং ভোডাফোন বেশি দামে ৪জি স্প্রেকট্রাম কিনে, মাশুল কমিয়ে গ্রাহক ধরে রাখার চেষ্টায় ব্যস্ত। ফলে আটার থেকে ডাটা সস্তা হয়ে গেল।

ঘরের টাকায় ব্যাবসা টিকিয়ে রাখতে গিয়ে বাকি পড়ে গেল লাইসেন্স ফি, ও স্পেকট্রাম ব্যবহারের চার্জ। একদিকে ব্যাবসার বহর কমছে বাকি টাকার পরিমাণ বাড়ছে এমন একটা পটভূমিতে এয়ারটেল ও ভোডাফোন-আইডিয়া এবং টেলিকম বিভাগকে সুপ্রিম কোর্টের তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ বকেয়া জমা দেওয়ার নির্দেশ জারি করে সুপ্রিম কোর্ট নিজস্ব দায়িত্ব পালন করেছে। কিন্তু এই নির্দেশের ফলে কী হতে পারে সেই বিষয়ে সর্বোচ্চ আদালত এবং সরকারের তরফে কোনো দিশা দেখানোর চেষ্টা নেই।

এয়ারটেল এবং ভোডাফোন-আইডিয়া যখন দিনের পর দিন লাইসেন্স ফি এবং স্প্রেকট্রাম ভাড়া বাকি রাখছিল তখন কিন্তু সরকারি স্তরে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ভোডাফোন-আইডিয়ার বকেয়া ৫৩,০৩৮ কোটি টাকা। এয়ারটেলের ৩৫,৫৮৬ কোটি টাকা। এয়ারটেল নাকি সেই টাকা আলাদাভাবে সরিয়ে রাখলেও, ভোডাফোন রাখতে পারেনি। রিলায়্যান্স জিয়ো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ১৯৫ কোটি টাকা মিটিয়েছে। ভোডাফোন-আইডিয়ার বকেয়া মোট ৫৩,০৪৮ কোটি টাকার মধ্যে লাইসেন্স ফি বাকি ২৮,৩০৯ কোটি টাকা আর ২৪,৭২৯ কোটি টাকা বাকি স্প্রেকট্রাম ব্যবহারের চার্জ বাবদ।

এই পরিস্থিতিতে ভোডাফোন-আইডিয়া সত্যিই ঝাঁপ বন্ধ করলে তাদের গ্রাহক, ডিস্ট্রিবিউটর, রিটেলার, যন্ত্রাংশের জোগানদার, লগ্নিকারী ও ঋণদাতা ব্যাঙ্ক, সংশ্লিষ্ট সব পক্ষই অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়বে। সেই অনিশ্চয়তা পুরো টেলি শিল্পের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে। ভোডাফোনের গ্রাহকদের ঠাঁই দেওয়ার উপযুক্ত পরিকাঠামো বাকি দুই বেসরকারি ও একটি সরকারি সংস্থার নেই। সেই পরিকাঠামো নতুন করে গড়ে তুলতে কয়েক বছর সময় লাগতে পারে। রিলায়্যান্স-জিয়ো বাদে অন্যদের ২জি প্রযুক্তি নির্ভর গ্রাহক রয়েছেন, যাঁদের সংখ্যা মোট গ্রাহকের প্রায় অর্ধেক তাঁদের কী হবে? এই প্রসঙ্গেই প্রশ্ন ওঠে ভোডাফোন-আইডিয়া বন্ধ হলে হাজার হাজার কর্মীর এবং তাদের পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্যদের কী হবে? সংস্থাগুলির থেকে স্পেকট্রাম কেনার যে অর্থ কিস্তিতে কেন্দ্র পায়, কোনো সংস্থা বন্ধ হলে তা রাজকোষে আসা নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হবে। স্পেকট্রাম কেনার পরে সংস্থাগুলি ১৮ বছর ধরে কিস্তিতে অর্থ মেটায়। সম্প্রতি তাতে ২ বছরের জন্য ছাড় দেওয়ায় তা বেড়ে হয়েছে ২০ বছর। কোনো সংস্থা ঝাঁপ বন্ধ করলে বা দেউলিয়া হলে কেন্দ্রই বা কীভাবে সেই টাকা পাবে? দেনার দায়ে ন্যুব্জ শিল্পের সংকট আরো বাড়লে, আসন্ন স্পেকট্রাম নিলামেই বা কে যোগ দেবে?

টেলিকম সংস্থা নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করলে, ব্যাঙ্কগুলিকে তার মূল্য দিতে হবে। সার্বিকভাবে লগ্নিকারীদের কাছেও ভুল বার্তা যাবে। কোনো কর্পোরেট সংস্থার ঝাঁপ বন্ধ হলেই দেশের অর্থনীতিতে তার প্রভাব পড়ে, সেটা যাতে না-হয়, তার চেষ্টা চালাতে কেন্দ্রের হাতে বিপুল ক্ষমতা ও উপায় রয়েছে। সংস্থাগুলির আর্থিক হাল ফেরাতে গ্রাহক পিছু আয় বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া উচিত। তা নেওয়া হয়নি বা নেওয়ার কোনো উদ্যোগও নজরে আসছে না।

ভোডাফোন-আইডিয়া সত্যিই বন্ধ হয়ে গেলে মোবাইল পরিষেবার দুনিয়া কার্যত দুটি সংস্থার প্রতিযোগিতায় সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। এমনিতেই মোবাইল পরিষেবার মাশুল বাড়ছে। প্রতিযোগিতা কমলে মাশুল আরো বাড়তে পারে। রিলায়্যান্স জিয়ো ব্যাবসা বাড়ানোর জন্য হঠাৎ করে মাশুল কমিয়ে দিলে এয়ারটেল প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে তো? বিএসএনএল এবং এমটিএনএল তো এমনিতেই প্রতিযোগিতায় নেই। সাইনবোর্ড ছাড়া সংস্থাদুটির হাতে আর কিছুই নেই।

এই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে একটা বিষয় বিশেষভাবে নজরে আসছে। পঞ্চাশ বছর আগে তখনকার শাসকগোষ্ঠীর আশীর্বাদ নিয়ে বাজারের দখল নিয়েছেন রিলায়্যান্স সংস্থার প্রথম পণ্য only Vimal। সমগ্র পরিস্থিতির হাল-হকিকত দেখে মনে হচ্ছে রিলায়্যান্স সংস্থার পঞ্চাশ বছর পূর্তির মরশুমে বাজারে আসতে চলেছে নতুন স্লোগান only জিয়ো।

চলে গেলেন শঙ্কর সেন

অমিতাভ রায়

ট্রলিতে শোয়ানো দেহ ভিতরে চলে যেতেই এসএসকেএম হাসপাতালের শারীরস্থান বিভাগের দরজার পাল্লাটা দুপুর তিনটে নাগাদ বন্ধ হয়ে গেল। চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা। তিরানব্বই বছরের উজ্জ্বল অধ্যায় একমুহূর্তে অতীত হয়ে গেল।

ইঞ্জিনিয়ার। শিক্ষক। প্রশাসক। সব ভূমিকায় সফল। ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দেশজোড়া খ্যাতি। বি ই কলেজের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে একটানা ৩১ বছর (১৯৫৫-১৯৮৬) শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর ছাত্ররা সারা বিশ্বে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছেন বা এখনও করে চলেছেন। ১৯৮৬-তে উপাচার্যর দায়িত্ব নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন। আর মন্ত্রী হিসেবে তাঁর ভূমিকাকে পশ্চিম বাংলার মানুষ এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। ছাত্রদরদী শিক্ষক এবং মানবদরদী প্রশাসক শঙ্কর সেন পরিণত বয়সে ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ প্রয়াত হয়েছেন। দেহদানের অঙ্গীকার করে যাওয়ার জন্য তাঁর মরদেহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাজে উৎসর্গ করা হয়েছে।

চিরনিদ্রায় শায়িত সর্বজনশ্রদ্ধেয় মানুষটিকে নিয়ে কোনো জনবহুল শোকমিছিল হয়নি। সরকারি নিয়মে পুলিশের গান স্যালুট হয়নি। এমনকী অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যমে তাঁর চিরবিদায়ের খবরও যথাযথভাবে প্রচারিত হয়নি। কিন্তু তাঁকে কি ভুলে যাওয়া যায়!

কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের যশস্বী অধ্যাপক প্রমোদচন্দ্র সেনের পঞ্চম পুত্র শঙ্কর সেন। মায়ের নাম মনোরমা। দক্ষিণ কলকাতার সত্যেন দত্ত রোডে পাঁচ ছেলে আর তিন মেয়ে নিয়ে প্রমোদ সেনের বসবাস। এখনও সদরের দরজার পাশে পি সি সেন লেখা আছে। তবে সময়ের ধারাবাহিকতায় পি অক্ষরটি অস্পষ্ট। ঢাকা জেলার সোনারং গ্রামে ছিল সেন পরিবারের আদি নিবাস। ১৯২৬-এর পয়লা ডিসেম্বর জন্মগ্রহণের পর এই পৈত্রিক বাড়িতেই শঙ্কর সেনের শৈশব কেটেছে। তীর্থপতি ইনস্টিটিউশনের ছাত্র। ১৯৪২-এ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ। গণিত এবং অতিরিক্ত গণিতশাস্ত্রে লেটার এবং অবশ্যই প্রথম বিভাগ। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে যাওয়ার লগ্নে দেশজুড়ে চলছে ভারত ছাড়ো আন্দোলন। সেই আন্দোলনে জড়িয়ে গিয়ে কারাবন্দী হলেন। ১৯৪২-এর সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে দমদম এবং আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে সব মিলিয়ে ৬১ দিন কাটাতে হল। জামিন নেওয়ার সুযোগ ছিল। নেননি। তবে নাবালক বলে নিঃশর্ত মুক্তি পেয়ে যান। আন্দোলনের জন্য কলেজের ভর্তি প্রক্রিয়া দেরিতে শুরু হওয়ায় পড়াশোনা বিঘ্নিত হয়নি। বঙ্গবাসী কলেজে আই এস সি-র ছাত্র। ১৯৪৪-এ পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ণ শাস্ত্র, গণিত এবং জীববিজ্ঞানে লেটার অর্থাৎ ৮০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ। জীববিজ্ঞানে ভালো নম্বর পেলেও তিনি বেছে নিলেন শিবপুর বি ই কলেজ। পেলেন মেধা বৃত্তি। ১৯৪৮-এ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে স্নাতক। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্মারক পদক দিয়ে তাঁর মেধাকে সম্মানিত করলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

সদ্য স্বাধীন দেশে ভারত সরকারের প্রথম রিসার্চ স্কলার হিসেবে বি ই কলেজে কাজ করার সুযোগ পেলেন। একই সঙ্গে হাতে এল সদ্যোজাত দামোদর ভ্যালি করপোরেশন বা ডিভিসি-তে যোগদানের নিয়োগপত্র। ডিভিসি-র বেতন বেশি। সঙ্গে রয়েছে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। আত্মীয়-পরিজন-বন্ধুবান্ধবদের অবাক করে দিয়ে ডিভিসি নয় বি ই কলেজের প্রায় অর্ধেক সাম্মানিককেই সম্মানের সঙ্গে স্বীকার করে নিলেন। অনেকে ভাবলেন ঢাকার বাঙাল বলে কথা! তবে কনিষ্ঠ পুত্রের বিবেচনায় সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছিলেন বঙ্গবাসী কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক প্রমোদচন্দ্র সেন।

লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ থেকে ১৯৫২-য় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডক্টরেট করার আমন্ত্রণ পেলেন। ভারত সরকারের বৃত্তি পাওয়া গেল। ঘটনাচক্রে একই জাহাজে

সহযাত্রী ছিলেন অশোক মিত্র। কী আশ্চর্য সমাপতন! দুজনেই বিভিন্ন সময় জ্যোতি বসু-র মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন এবং দুজনই দ্বিতীয় দফায় মেয়াদ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৫৫-এ ইম্পিরিয়াল কলেজের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর প্রথম ডক্টরেট হয়ে ফিরে এলেন শঙ্করকুমার সেন। এটাই তাঁর নথিভুক্ত আনুষ্ঠানিক নাম। ছাত্রদের এসকেএস।

বি ই কলেজের তখনকার অধ্যক্ষ এ সি রায় তাঁর জন্য স্নাতকোত্তর স্তরে একটি নতুন পদ সৃষ্টি করলেন। সদ্য স্থাপিত খড়গপুর আইআইটি-ও অধ্যাপনার আমন্ত্রণ জানাল। সেখানকার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রধান এস আর সেনগুপ্ত বি ই কলেজের প্রাক্তনী এবং অধ্যাপক। শঙ্কর সেন নিজেও তাঁর ছাত্র। সবিনয়ে শিক্ষকের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন।

তারপর দেখতে দেখতে ৩১ বছর। বি ই কলেজেই অধ্যাপনা করলেন। ১৯৬৫-তে পেলেন বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব। আবার ১৯৭৮-এ নিজেই নতুন বিধি প্রবর্তনের উদ্যোগ নিলেন। অধ্যাপক পদমর্যাদার শিক্ষকদের মধ্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালনের প্রস্তাব করলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পাওয়ার পর স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলেন বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব।

বরাহনগরের আই এস আই-এর পর রাজ্যের কোনো শিক্ষায়তনে প্রথম কম্পিউটার বি ই কলেজেই সংস্থাপিত হল। উদ্যোক্তা অবশ্যই শঙ্কর সেন। ১৯৭৫-এর ডিসেম্বরে পৃথিবীতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রথম বাজারে এল মাইক্রোপ্রসেসর। দেশের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বি ই কলেজের ছাত্রদের পড়ানো শুরু হল মাইক্রোপ্রসেসর। সেই ছাত্ররাই বিভাগীয় অধ্যাপকদের নেতৃত্বে ১৯৭৮-এ কলকাতার বি-বা-দী-বাগ এলাকায় সংস্থাপন করলেন মাইক্রোপ্রসেসর-ভিত্তিক দেশের প্রথম স্বয়ংক্রিয় যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বা অটোম্যাটিক ট্রাফিক সিগন্যাল। এখনকার কম্পিউটার থেকে শুরু করে মোবাইল ফোন এককথায় ভারতীয় ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার প্রাণভোমরা এই মাইক্রোপ্রসেসর। তাঁর দূরদর্শিতা অনস্বীকার্য। আর এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ১৯৭৯-তে বি ই কলেজে স্থাপিত হল নতুন বিভাগ, কম্পিউটার সায়েন্স। পরিকল্পনা এবং রূপায়ণ করলেন অবশ্যই শঙ্কর সেন।

উনিশশো সত্তরের দশকের শেষের দিকে লিখলেন 'ইলেকট্রিক্যাল মেশিনস' শিরোনামের কলেজপাঠ্য বই। দিল্লি থেকে প্রকাশিত বইটির দাম সত্তর টাকা। তখনকার দিনে অনেক টাকা। আবার একই বিষয়ের বিদেশি বইগুলোর তুলনায় অনেক কম দাম। শুধুমাত্র ডায়নামিক মেশিন বইটিতে স্থান পেয়েছিল। জনাকয়েক ছাত্র আবেদন জানিয়ে বলে যে স্ট্যাটিক মেশিন অর্থাৎ ট্রান্সফরমার বইটির করা দরকার। হাসিমুখে ছাত্রদের আবদার মেনে নেওয়ার পরের সংস্করণে সংযুক্ত হল ট্রান্সফরমার অর্থাৎ স্ট্যাটিক মেশিন। এবং বইটির দাম হল পঞ্চাশ টাকা। কারণ জিজ্ঞাসা করে জানা গেছিল যে প্রকাশককে তো ছাপার ব্লক নতুন করে তৈরি করতে হয়নি। তখনকার সময় প্রতিটি ছবি-গ্রাম ছাপানোর জন্য আলাদা আলাদা সিসার ব্লক তৈরি করতে হত। প্রকাশকের সাশ্রয়ের সুযোগ ছাত্রদের মধ্যে বন্টনের কথা মাথায় থাকলেই এমনটা হতে পারে। 'ইলেকট্রিক্যাল মেশিনস' এখন তো ভারতীয় উপমহাদেশের সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অবশ্যপাঠ্য। একটা বইয়ের যে কত সংস্করণ হতে পারে তা এই বইটি হাতে নিলেই বোঝা যায়।

।। দুই ।।

১৯৬৭-তে পশ্চিম বাংলায় প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর বি ই কলেজের অধ্যাপকদের একটি প্রতিনিধিদল শিক্ষামন্ত্রী সত্যপ্রিয় রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়। কলেজের উন্নয়নের বিষয়ে আলোচনা করার জন্য এই সাক্ষাৎকারের আয়োজন। আলোচনার পর শিক্ষামন্ত্রী জানান বছরে তিনশো ইঞ্জিনিয়ার তৈরির জন্য যে বাড়তি টাকার দরকার সেই টাকায় সারা রাজ্যে তিন হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলা যায়। শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপকদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন সীমিত বাজেটে কী করা উচিত। শঙ্কর সেনের নেতৃত্বাধীন অধ্যাপকরা সেদিন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবে সায় দিয়ে ফিরে এসেছিলেন। ছাত্রদের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলার সময় এই আলোচনার কথা বারেবারেই উল্লেখ করতেন। ছাত্রদের বলতেন যে সামাজিক প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে প্রকল্প প্রণয়ন একজন ইঞ্জিনিয়ারের অবশ্য কর্তব্য।

বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে পশ্চিম বাংলার সরকারি ক্ষেত্রে কর্মরত ডাক্তার এবং ইঞ্জিনিয়ারদের কর্মবিরতি আন্দোলন শুরু হয় ১৯৭৪-এর ২১শ ফেব্রুয়ারি। কনফেডারেশন অফ ইঞ্জিনিয়াস অ্যান্ড ডক্টর্স এর অংশীদার বি ই কলেজ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন। বিয়াল্লিশ দিন ধরে চলতে থাকা এই আন্দোলনে মেডিক্যাল কলেজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষকরা জড়িয়ে থাকলেও ছাত্রদের পড়াশোনার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হয়নি। দাবিদাওয়া সংবলিত ব্যাজ বুকে এঁটে তাঁরা নিয়মিত ক্লাস নিতেন। তবে কোনো প্রশাসনিক কাজে অংশ নিতেন না। ক্লাস শেষ হলেই ৫৫ নম্বর বাসে চড়ে শঙ্কর সেনের নেতৃত্বে প্রতিদিন বি ই কলেজের একদল শিক্ষক কর্মবিরতিতে অংশ নেওয়া সহকর্মীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য কলকাতার

উদ্দেশে রওনা দিতেন। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের ঔদ্ধত্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে চলেছিল বিয়াল্লিশ দিনের কর্মবিরতি।

জরুরি অবস্থা জারির আগে ৪ এপ্রিল কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে জয়প্রকাশ নারায়ণের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বি ই কলেজের কয়েকজন ছাত্র সেই সভায় উপস্থিত ছিল। পরের দিন সকালে সেই ছাত্রদের পরীক্ষা হল থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে শারীরিক নির্যাতন করা হয়। অন্য পরীক্ষার্থীরা প্রতিবাদ করতে শুরু করলে কলেজের তখনকার অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ অবস্থা সামাল দিতে পরীক্ষাহলে অবতীর্ণ হন। খবর পাওয়ামাত্র দোর্দণ্ডপ্রতাপ অধ্যক্ষের ঘরে ছুটে যান শঙ্কর সেন। সঙ্গে ছিলেন অন্যান্য বিভাগের আরো কয়েকজন অধ্যাপক। সকলেই আজ প্রয়াত। আর ঘটনার পরের দিন প্রতিবাদ জানান বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব অশোক মুখোপাধ্যায়। তিনি তখন বি ই কলেজে ইংরেজি পড়াতেন। আর পরীক্ষা হলে তাণ্ডব চালানোর সময় ইংরেজিরই পরীক্ষা চলছিল। অধ্যক্ষের সঙ্গে বাদানুবাদ এমন পর্যায়ে চলে যায় যে ছাত্রদের উপর হামলার প্রতিবাদে বি ই কলেজ ছেড়ে চলে গেলেন অশোক মুখোপাধ্যায়। এই প্রতিবাদ প্রক্রিয়াকে সমর্থন করে এগিয়ে আসেন শঙ্কর সেন। কলেজ কাউন্সিলের সভায় নিন্দা প্রস্তাব এনে বিষয়টিকে নথিভুক্ত করান। ততদিনে দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়ে গেছে।

১৯৭৮-এর ভয়াবহ বন্যায় রাজ্যের অন্যান্য এলাকার মতো বি ই কলেজও বিপর্যস্ত। কলেজ প্রাঙ্গণ এক কোমর জলের তলায় তলিয়ে গেছে। বিদ্যুতের সাব-স্টেশনেও জল থইথই করছে। তিনদিন ধরে পুরো কলেজ অন্ধকার। সে এক ভয়াবহ অবস্থা। জল একটু কমার পর ২৯ সেপ্টেম্বর সকালে একজন ছাত্র এবং এক সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে সাব-স্টেশনে উপস্থিত হলেন শঙ্কর সেন। অন্য সকলকে দূরে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে কাজ শুরু করলেন। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিভাগীয় ল্যাবরেটরি থেকে নিজের দায়িত্বে নিয়ে এসেছেন। সারাদিন একটানা কাজ করার পর সন্ধের আগেই বি ই কলেজের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা চালু হল। বন্যা বিধ্বস্ত বি ই কলেজ সেদিন বুঝতে পারে যে শঙ্কর সেন শিক্ষক হিসেবে সুপরিচিত হলেও ব্যবহারিক ইঞ্জিনিয়ারিং-এও তিনি সমান দক্ষ। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেদিন যেভাবে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তার কোনো তুলনা নেই।

বি ই কলেজের রি-ইউনিয়ন বহুকাল ধরেই বিখ্যাত। বর্তমান এবং প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে যোগাযোগ তৈরির এক আদর্শ মঞ্চ। বর্তমান ছাত্ররা আয়োজন করে। কয়েকজন শিক্ষক পরামর্শ দিয়ে থাকেন। বর্তমান এবং প্রাক্তন পড়ুয়াদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে অর্থসংস্থান হয়। দেশের সমস্ত বিখ্যাত শিল্পীদের নিয়ে প্রতিদিন সন্ধ্যায় আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রাগসংগীতের অনুষ্ঠান তো সারারাত ধরে চলত। এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হলে দেশের বিখ্যাত শিল্পীরা এককথায় সম্মতি জানাতেন। সত্তর দশকের প্রথম দিকে বিশেষত জরুরি অবস্থার সময় যখন কলেজে সন্ত্রাসের আবহ বিরাজমান তখন থেকেই রি-ইউনিয়নের অনুষ্ঠান মর্যাদা হারাতে থাকে। প্রাক্তনীরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। সাতাত্তরে কলেজে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে এলেও রি-ইউনিয়নের জন্য প্রাক্তনীদের কাছ থেকে তেমন একটা সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এই অবস্থায় এগিয়ে এলেন শঙ্কর সেন। নিজের প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা তুলে রি-ইউনিয়নের সম্মান রক্ষা করলেন। পরে ছাত্ররা চাঁদা জোগাড়ের পর থেকে সেই টাকা ধাপে ধাপে ফিরিয়ে দেয়।

১৯৮২-তে দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হলে বিদ্যুৎ বিভাগের দায়িত্ব পেলেন শঙ্কর গুপ্ত। রাজ্যের বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান করার জন্য তিনি বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ করেন। উৎপাদন ব্যবস্থার হাল ফেরানোর জন্য দেশের সেরা ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়োগের বন্দোবস্ত হল। সরবরাহ এবং বণ্টন ব্যবস্থার দায়িত্ব পেলেন বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু কলকাতার সমস্যার সমাধান করা যাচ্ছে না। কারণ কলকাতার বিদ্যুৎ সরবরাহ করে একটি বেসরকারি সংস্থা। দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি অনুযায়ী সংস্থার নিজস্ব উৎপাদন এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ থেকে বিদ্যুৎ কিনে গ্রাহকদের কাছে সরকার নির্ধারিত দরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করাই তাদের ব্যাবসা। রাজ্যে তখন চাহিদার থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন কম। ফলে সরকারি নিয়ম মেনে সমস্ত সরবরাহকারী সংস্থা নিয়ন্ত্রিতভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। সারাদিনে ছয় থেকে আট ঘন্টা কলকারখানা থেকে শুরু করে বাড়িঘরে বিদ্যুৎ থাকে না। অথচ কলকাতার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাটির লাভ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য শঙ্কর সেন এবং বাণীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে দুই সদস্যের একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী শঙ্কর গুপ্ত। বাণীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বি ই কলেজের প্রাক্তনী। বহুদিন বিদেশে কাজ করার পর আইআইএম কলকাতায় পড়ানোর আমন্ত্রণ পেয়ে দেশে ফিরে আসেন। পরে ভারত সরকার একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার দায়িত্ব তাঁর কাঁধে তুলে দেয়। বাণীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৮০-র দশকে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অধ্যক্ষ হিসেবেও তিন বছর কাজ করেছেন। টাস্ক ফোর্সের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার জন্য বি ই কলেজের স্নাতকোত্তর স্তরের একজন ছাত্রকে নিয়োগ করা হল। ১৯৮৩-র ২২ জানুয়ারি শঙ্কর গুপ্তের

জীবনাবসান হলে টাস্ক ফোর্সের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে যায়। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু কাজ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলে আবার পুরোদমে কাজ শুরু হয়। কলকাতা এবং শহরতলির বিভিন্ন এলাকায় যন্ত্রপাতি কাঁধে নিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্রটিকে মিটার রিডিং নিতে হয়। আবার দিনের শেষে সেই তথ্য নিয়ে শঙ্কর সেন এবং বাণীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করতে হয়। সে এক দুরূহ কাজ। একই সঙ্গে সরবরাহকারী সংস্থার দপ্তর থেকে সংগ্রহ করতে হয় মিটার রিডিং-এর সময় সেই এলাকায় কত বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছিল। অবশেষে ১৯৮৩-র মে মাসে জটিল প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া গেল। বিদ্যুতের চাহিদা বাড়লেও বণ্টন ব্যবস্থাকে যথাযথভাবে শক্তিশালী করে না তোলার জন্য এই সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ বেশি গ্রাহককে একটি ট্রান্সফরমার মারফত বিদ্যুৎ সরবরাহ করায় মিটার দ্রুত ঘুরে বিদ্যুতের বিল বাড়িয়ে দিচ্ছে অথচ বাস্তবে গ্রাহক কিন্তু যথাযথ বিদ্যুৎ পাচ্ছে না। এটি সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্তিগত সমস্যা। বণ্টন ব্যবস্থাকে যথাযথভাবে শক্তিশালী না করে বেশি গ্রাহককে সন্তুষ্ট করতে হলে এমনটাই হয়। তবে বিষয়টি অনিচ্ছাকৃত না সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক তা বিবেচনার দায়িত্ব টাস্ক ফোর্সের ছিল না। একটি প্রযুক্তি বিষয়ক রিপোর্টকে সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে তোলা বেশ কঠিন কাজ। প্রাথমিক খসড়া রচনার পর কতবার যে কাটাছেঁড়া করে চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরি হয়েছিল তার হিসেব সম্ভবত টাস্ক ফোর্স রাখেনি। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে সময় পাওয়ার পর টাস্ক ফোর্সের দুই সদস্য পুরো বিষয়টি তাঁকে বুঝিয়ে এলেন। অবশেষে এসে গেল ১৪ জুন ১৯৮৩। মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে মিটিং। টাস্ক ফোর্সের দুই সদস্য এবং তাঁদের সহায়ক ছাত্রটি আমন্ত্রিত। বেসরকারি বিদ্যুৎ সংস্থার বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা উপস্থিত। মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সভার কাজ শুরু হলে টাস্ক ফোর্সের পর্যবেক্ষণ পরিবেশন করা হল। বেসরকারি বিদ্যুৎ সংস্থার কর্তারা প্রাথমিক পর্যায়ে আপত্তি জানালেন। শঙ্কর সেন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অঙ্ক কষে বুঝিয়ে দিলেন কেন এমন হয়। বাণীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় পেশাদারি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সহজ ভাষায় বিশ্লেষণ করে বললেন যে এর ফলে গ্রাহকের দুর্দশার মাধ্যমে সংস্থা কত বেশি লাভবান হচ্ছে। বেসরকারি বিদ্যুৎ সংস্থার কর্তারা যাবতীয় যুক্তি-বিশ্লেষণ মেনে নিয়েও জানালেন যে তাঁদের সরবরাহ ব্যবস্থায় এমনটি হয় না। সহায়ক ছাত্রটির ঝোলা থেকে বের হল তথ্য। বেসরকারি বিদ্যুৎ সংস্থার তরফে যে তথ্য দেওয়া হয়েছিল এবং দিনক্ষণ ও ঠিকানা ধরে ধরে বিভিন্ন গ্রাহকের মিটার রিডিং। এরপর আর তর্ক চলে না। মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হল যে একসঙ্গে এত ট্রান্সফরমার পাওয়া যাবে না। সভার সমাপ্তি লগ্নে মুখ্যমন্ত্রী বলে দিলেন ধাপে ধাপে এক বছরের মধ্যে সংস্থার দায়িত্বে থাকা ৫৬৭ বর্গকিলোমিটার এলাকার বিদ্যুৎ বণ্টন ব্যবস্থাকে সুসংহত করতে হবে। ফল হয়েছিল। এক বছরের মধ্যেই কলকাতা এবং শহরতলির দশ লক্ষের বেশি গ্রাহকের বিদ্যুতের বিল কমতে শুরু করে। প্রায় এক বছর ধরে নিরলস পরিশ্রম করে একজন ইঞ্জিনিয়ারের সামাজিক দায়িত্ব কত গুরুত্বপূর্ণ তা শঙ্কর সেন বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এই কাজের জন্য টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা কোনো পারিশ্রমিক নেননি। যাতায়াতের জন্য গাড়িও ছিল না। শিবপুর থেকে ৫৫ নম্বর বাস সম্বল করেই যাতায়াত। এমনকী এই কঠিন কাজটি সম্পর্কে তিনি কোনো প্রচারও পছন্দ করতেন না। তবে সেদিনের সেই ছাত্রটি পরবর্তী জীবনে কর্মসূত্রে এই পদ্ধতিটি রাজধানী দিল্লির বিদ্যুৎ বণ্টন ব্যবস্থায় প্রয়োগ করার সুযোগ পাওয়ায় দিল্লির বিদ্যুৎ গ্রাহকদের কিছুটা সুরাহা হয়।

।। তিন ।।

১৯৮৬-তে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেলেন। মাত্র পাঁচ বছরের সময়সীমায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে যুক্ত হল পাঁচটি নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়। কনস্ট্রাকশন প্রোডাকশন, পাওয়ার, ইন্সট্রুমেন্টেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কম্পিউটার সায়েন্স। এ ছাড়া পরিবেশ, শক্তি, সমুদ্রবিদ্যা, চলচ্চিত্রচর্চা, বয়স্ক শিক্ষা ইত্যাদি পাঁচটি বিষয়ে স্থাপিত হল গবেষণাভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্র। বিধাননগরে স্থাপিত হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় প্রাঙ্গণ। ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রক/বিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানোন্নয়নে তিনি তখন ব্যস্ত। দিনের শেষে বাড়ি ফিরে হাসিমুখে বলতেন যে সারাজীবন মোহনবাগানের হয়ে খেলার পর ইস্টবেঙ্গলের কোচ হিসেবে কাজ করতে হচ্ছে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হওয়ার পর রাজ্যের কর্মরত ইঞ্জিনিয়ারদের প্রায় সকলেই তাঁর ছাত্র হয়ে গেল। শিবপুর এবং যাদবপুর দুই শিক্ষায়তনের প্রাক্তনীরা গর্বের সঙ্গে বলতে শুরু করল যে তারা শঙ্কর সেনের ছাত্রছাত্রী। তাঁর মধ্যে এই বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নজর এড়ায়নি। ১৯৮৬-র ৬ই আগস্ট রাজ্য সরকারের ইঞ্জিনিয়াররা বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে কর্মবিরতি আন্দোলন শুরু করেন। প্রশাসন এবং আন্দোলনকারীদের সংগঠন নিজের নিজের জায়গায় টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোনোভাবেই মীমাংসাসূত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এক এক করে একশো দিন হয়ে গেল। কর্মবিরতি শেষ হওয়ার কোনো

সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ করে বললেন, সকলেই তো আপনার ছাত্র। সমাধানের চেষ্টা করুন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শঙ্কর সেনের মধ্যস্থতায় ১১২ দিনের কর্মবিরতির অবসান হল। রাজ্য সরকারের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগগুলির প্রশাসনিক প্রধানের দায়িত্ব ইঞ্জিনিয়ারদের হাতে তুলে দেওয়া হল। কর্মবিরতি আন্দোলনের এটাই ছিল অন্যতম প্রধান দাবি।

বামফ্রন্ট সমর্থিত নির্দল প্রার্থী হিসেবে দমদম বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হয়ে ১৯৯১-এ হলেন মন্ত্রী। তাঁর নির্বাচনি প্রতীক ছিল কাস্তে হাতুড়ি তারা। জনাকয়েক প্রাক্তন ছাত্র মজা করে প্রশ্ন করেছিলেন যে সি পি আই (এম)-এর প্রতীক নিয়ে দাঁড়িয়ে নির্দল বলার কী দরকার? সরাসরি জবাবে তিনি জানিয়েছিলেন যে তিনি সি পি আই (এম)-এর সদস্য নন। আর সি পি আই (এম) মনোনয়ন না দিলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। বিদ্যুৎ বিভাগ ছাড়া মন্ত্রী হিসেবে তাঁকে সামলাতে হত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং অপ্রচলিত শক্তি বিভাগ। এই প্রথম তাঁকে প্রচারের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠতে দেখা গেল। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত শিবপুর, যাদবপুরের প্রাক্তনীরা স্যার বলতে অজ্ঞান। এমনকী দুর্গাপুর, জলপাইগুড়ি থেকে পাশ করা ইঞ্জিনিয়াররাও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন। তিনি হয়ে গেলেন সকলের স্যার। সঙ্গে রয়েছে রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বামফ্রন্টের সংগঠন। তিনি এগিয়ে চললেন। রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য শঙ্কর গুপ্ত যে নীল নকশা চূড়ান্ত করেছিলেন তাকে বাস্তবায়নের লক্ষে এগিয়ে চললেন শঙ্কর সেন। সাগরদিঘি বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হল। পুরুলিয়া পাম্প স্টোরেজ প্রকল্প চালু করে বাণীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করলেন। অযোধ্যা পাহাড়ের গ্রামগুলোতে ঝলমলিয়ে উঠল সৌর বিদ্যুতের আলো। এইরকম আরো কত কিছু। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তাঁকে স্বাধীন ভাবে কাজ করার যে সুযোগ দিয়েছিলেন তার সদ্ব্যবহার করে শঙ্কর সেন পশ্চিম বাংলাকে আলোকজ্জ্বল করে তুললেন। নিজেও তখন প্রচারের আলোয় উদ্ভাসিত। চারপাশে গুণগ্রাহীর সমাবেশ। রাজ্যের সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারদের তিনি সর্বজনীন স্যার হয়ে গেলেন। কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার বাড়িয়ে দিলেন সহযোগিতার হাত। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা তাঁর ছাত্ররাও পিছিয়ে নেই। বিদেশে থাকা প্রাক্তনীরাও এগিয়ে এলেন।

কর্মব্যস্ত আলোকজ্জ্বল মরশুমে ১৯৯৫-র ১৫ ডিসেম্বর চলে গেলেন জীবনসঙ্গিনী বন্দনা সেন। প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন শঙ্কর সেনের মতোই ছাত্রদরদী। যে-কোনো বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের পরম ভরসাস্থল। স্বভাবগম্ভীর অধ্যাপককে যে কথা বলা যেত না, ভয় লাগত, সেইসব বিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা নির্দ্বিধায় বন্দনা সেনের কাছে বলে আসতে পারত। ছাতছাত্রীদের প্রশ্রয় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মতো বকাঝকা করতেও দ্বিধা করতেন না। সত্তর দশকের সেই উত্তাল সময়ে যখন কোনো কোনো ছাত্র যারা এখনকার দ্বেষপ্রেমী শাসকদের ভাষায় দেশদ্রোহী, যাদের খোঁজে বিভিন্ন হস্টেলে সন্ত্রাসীরা হানা দিচ্ছে, সেই বিপদের দিনে ভয়ার্ত ছাত্রদের শেষ আশ্রয় ছিলেন বন্দনা সেন। স্বভাবগম্ভীর শঙ্কর সেনের কলেজের আবাসনে হানা দেওয়ার সাহস সন্ত্রাসীদের ছিল না। স্ত্রীবিয়োগের পর চারপাশে গুণগ্রাহীর ভিড় না কমলেও ব্যক্তিজীবনে বড্ড একা হয়ে গেলেন শঙ্কর সেন। বড়ো মেয়ে অনুরাধা বিবাহসূত্রে প্রবাসী। ছোটো মেয়ে অনসূয়া দিল্লির বাসিন্দা। এদিকে কাজের শেষ নেই। তিনি তো দপ্তরে বসে কাজ করতে অভ্যস্ত নন। আজ সাগরদিঘি তো কাল পুরুলিয়া পরশু শিলিগুড়ি। প্রশাসনিক সভা, জনসভার সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। সরকারি খরচ কমানোর জন্য লোক্যাল ট্রেনেই যাচ্ছেন ব্যান্ডেল, কোলাঘাট।

কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে শঙ্কর সেনের দায়িত্ব বেড়ে গেল। জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ বা ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিলের সভায় স্থির হয় যে সারা দেশের বিদ্যুতের মাশুলের হার সমান করা দরকার। এই দুরূহ কাজটি করার জন্য সমস্ত রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রীদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হল। অধ্যক্ষ হলেন তখনকার কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী। বাস্তবে হাতেকলমে পুরো কাজটি সম্পন্ন করলেন শঙ্কর সেন। সমস্ত রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রীদের সামলিয়ে খুব কম সময়ের মধ্যে বিশেষত স্বল্পমেয়াদি যুক্তফ্রন্টের সরকারের পতনের আগেই শঙ্কর সেন রিপোর্ট জমা করতে পেরেছিলেন। পরের সরকারের আমলে স্বাভাবিকভাবেই এই বাস্তবসম্মত দলিল নিয়ে আর কোনো কাজ হয়নি।

আকস্মিকভাবে ১৯৯৮-এর অক্টোবর মাসে তিনি রাজ্যের বিদ্যুৎ মন্ত্রীর পদ থেকে সরে গেলেন। অনেকে এই সংবাদ কাটাছেঁড়া করতে সময় খরচ করেছেন। জ্যোতি বসু এবং শঙ্কর সেন কিন্তু এ বিষয়ে একটিও শব্দ উচ্চারণ করেননি। কিছুদিন পর সিকিম সরকারের আমন্ত্রণে সেখানকার বিদ্যুৎ উপদেষ্টা হিসেবে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ শুরু করেন। শঙ্কর সেনকে অসমের জামাতা আখ্যা দিয়ে রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার একটি সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানালেন অসমের তখনকার মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ। বন্দনা

সেনের জন্মস্থান তিনসুকিয়া জেলার মার্গারিটা। কোনো সূত্রে তরুণ গগৈ খবরটি পেয়ে যোগাযোগ করতে দেরি করেননি। শঙ্কর সেনও আপত্তি করেননি। বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার ক্রিয়াকর্মাদির সঙ্গেও জড়িয়ে গেলেন। সবমিলিয়ে আনুষ্ঠানিক কর্মজীবনের নিয়মানুবর্তিতা মেনে নিয়েই নিজের মতো করে একটি কর্মব্যস্ত জীবনযাপন করে চলছিলেন শঙ্কর সেন। শিক্ষকজীবনের মতো ব্যক্তিজীবনেও সময়ানুবর্তিতা বজায় ছিল। মন্ত্রী থাকাকালীন যারা সবসময় চারদিকে ঘিরে থাকত তাদের ভিড় কমতে শুরু করল। বাড়িতে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের আনাগোনা কিন্তু একইরকম থেকে গেল। কোনো ছাত্র অনেকদিন যোগাযোগ না রাখলে ফোন করে ধমক লাগাতে দ্বিধাবোধ করতেন না। এমন স্নেহসিক্ত তিরস্কারের সুযোগ কতজন ছাত্র পায়। শিবপুরের ছাত্ররাই ছিল দলে ভারী। সেখানেই তো তিনি একটানা একত্রিশ বছর শিক্ষকতা করেছেন। অন্য হিসেবে ১৯৪৪ থেকেই বি ই কলেজের সঙ্গে তাঁর নিবিড় নিবন্ধন। সেখানেই তাঁর নির্দেশনায় গবেষণা করে তেরোজন ছাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পি এইচ ডি করেছিলেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থাকাকালীন নিয়মিত ক্লাস নিলেও সময়াভাবে ছাত্রদের গবেষণায় তেমনভাবে জড়িয়ে পড়তে পারেননি। ধরেবেঁধে একজন ছাত্রকে পি এইচ ডির জন্য পঞ্জিকরণ করালেও বিভিন্ন কারণে প্রচেষ্টাটি সফল হয়নি।

শঙ্কর সেনের প্রয়াণের খবর যেটুকু সংবাদমাধ্যমে সম্প্রচার করা হল সেখানে প্রাক্তন মন্ত্রী ও প্রাক্তন উপাচার্য হিসেবেই তাঁর পরিচয় দেওয়া হল। ছাত্রদরদী শিক্ষানুরাগী ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষককে সংবাদমাধ্যম একেবারেই ভুলে গেল। হয়তো সেই কারণেই তাঁর মরদেহ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বা নতুন নামে পরিচিত শিবপুরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাওয়ার পর বর্তমান প্রজন্মের কোনো ছাত্রছাত্রীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে দেখা যায়নি। মন্ত্রী থাকাকালীন যাঁরা সবসময়ই চারপাশে ঘিরে থাকতেন তাঁরাও অনুপস্থিত। হাতে গোনা জনকয়েক প্রাক্তন ছাত্র উপস্থিত। বিদায়বেলায় শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন বামফ্রন্টের রাজ্য নেতৃত্ব যাঁদের সঙ্গে বেলাঅবেলায় গত তিন দশক ধরে পথ চলেছেন শঙ্কর সেন। সরকারি প্রথানুসারে রাজ্য বিধানসভায় শ্রদ্ধা নিবেদন করা হল। অবশেষে ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা এবং বিজ্ঞান আন্দোলনের উজ্জ্বলতম পথপ্রদর্শক চিরবিদায় নেওয়ার মুহূর্তে বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন শুধু জীবনে নয় মরণের পরেও মানুষের জন্য কাজ করে যাওয়া যায়।

মার্জনা

গত সংখ্যায় (১৬-২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০) সংস্কৃতি জগতের অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব খালেদ চৌধুরীর জন্মশতবর্ষ মনে রেখে একটি মূল্যবান লেখা প্রকাশ করতে পেরে আমরা গর্ববোধ করেছি। কিন্তু লেখক প্রদীপ দত্তের নাম ‘প্রদীপ্ত দত্ত’ মুদ্রিত হওয়ায় আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। আশা করি শ্রীপ্রদীপ দত্ত আমাদের মার্জনা করেছেন।

—সম্পাদক

ভাইরাস ভাবনা

মানসপ্রতিম দাস

'আমি কি ডরাই সখী ভিখারি ভাইরাসে!' স্মরণযোগ্য অতীতে এমন প্যারডি কেউ করার সাহস দেখিয়েছেন বলে জানা নেই। ফলে এমন একখানা সংলাপ নেহাতই কল্পিত। এমনিতে ভাইরাস ভিখারি প্রকৃতির ঠিকই, একজন পোষক বা ইংরেজিতে যাকে বলে হোস্ট, তেমন একটা জীবিত শরীর না পেলে তার জীবনবৃত্তান্ত বলে কিছুই নেই। প্রোটিন মোড়া ডি-এন-এ (বা আর-এন-এ) পড়ে থাকে নির্জীব হয়ে। কিন্তু আদতে ভাইরাস ভয়ংকর! সকালে খবরের কাগজের প্রথম পাতা থেকে মোবাইলে রাতের শেষ মেসেজ অবধি আমরা এখন সে বার্তাই পাচ্ছি। নভেল করোনা ভাইরাস, নতুন নামকরণে কোভিড-১৯, ভাইরাসের সভ্যতা-কাঁপানো ক্ষমতা জানান দিচ্ছে। চীনে উৎপন্ন হয়ে কোভিড দেশ থেকে দেশান্তরে পাড়ি দিচ্ছে ইচ্ছেমতো, আক্রান্ত এবং মৃতের সংখ্যা বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। কোনো পরিসংখ্যান যোগ করার মানে নেই কারণ এ লেখা প্রকাশের সময় সেটা অবান্তর হয়ে যাবে। কিন্তু আবির্ভাবেই ট্রিপল সেঞ্চুরি করার মতো কৃতিত্ব দেখিয়েছে এই জীবাণু (নাকি বীজাণু?)। অন্তত রোগ ছড়ানোর ক্ষেত্রে সার্স ভাইরাসের কীর্তিও ম্লান হয়েছে কোভিডের কাছে।

কিন্তু এসব আলোচনা করছি কেন? কী দরকার এর? কম আলোচনা তো হয়নি মিডিয়ায়! ভয় জাগানো কম পরিসংখ্যান তো পরিবেশিত হয়নি নিউজপ্রিন্টে! তা হলে? তথ্যের এই পুনরাবৃত্তির সপক্ষে যুক্তি একটাই— ভাইরাস ফিরে ফিরে আসে। এবারে ঋতু বদলালে তাপমাত্রা বাড়বে, হয়তো নিঃশব্দে থামবে কোভিড-১৯ ভাইরাসের দৌড়। কিন্তু কখন যে সেটা আবার ফিরবে রোগভোগ আর মৃত্যু ঘটাতে তা কেউই জানি না আমরা! হয়তো প্রত্যেক বছরে এই সময়ে সেটা ফিরবে নিয়ম করে। অথবা হয়তো বেশ কয়েক বছর বা দশক ঘাপটি মেরে পড়ে থেকে সেটা আরো বড়ো মহামারী ঘটাতে ফিরে আসবে। এসবের বিরুদ্ধে আমাদের সুরক্ষা একটাই— আমাদের জ্ঞান। শুধু চিকিৎসকের কাছে এই জ্ঞান থাকলেই যদি চলে যেত তবে সাদা কাগজে মসীলেপন না করলেও চলত। জনগোষ্ঠীর মধ্যে জ্ঞান ছড়িয়ে না পড়লে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নেওয়া একেবারেই সহজ হয় না। তাই ভাইরাস ভাবনা।

না-মানুষের মধ্যে উৎস

মটন-চিকেন পেলেই সন্তুষ্ট আম বাঙালি। অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় বঙ্গসন্তান আরো কত পশুপাখির দিকে যে হাত বাড়ায় তার হিসেব রাখা দায়। না-জেনেবুঝে যখন সেই বাঙালিই ফাস্ট ফুড সেন্টার থেকে ভাগাড়ের ফসল মানে বেড়াল-শেয়ালের মাংস পেটে চালান করে তখন সব হিসেবই গুলিয়ে যায়। বাংলায় লেখা হচ্ছে বলে এমন ব্যাপারস্যাপারের দায় কেবল বাঙালির উপর চাপানো ঠিক নয়। মাংসের রান্নায় আজ সীমাহীন বৈচিত্র্য বিশ্বজুড়ে। সব মাংস যে রান্না করে তবে উদরস্থ করা হয় এমনও নয়। স্থানীয় রীতিনীতি অনুযায়ী আধসেদ্ধ বা নেহাতই কাঁচা মাংসও জায়গা পায় প্লেটে। খাদ্যরসিক এবং বৈচিত্র্যপিপাসু মানুষ এসব নিয়ে বিপুল আমোদ করবেন বই কী! কিন্তু কথা হচ্ছে যে এ জগতে বহু জিনিসের সঙ্গে ফাউ মেলে, না চাইতেই। মাংসের সঙ্গে, এমনকী অনেক রকম মাছের সঙ্গেও, তেমনভাবেই ফাউ হয়ে আসে ভাইরাস! এ নিয়ে বিন্দুমাত্র আমোদের সুযোগ নেই। ত্রাস জাগানো কোভিড-১৯ মানুষের শরীরে ঢুকেছে না-মানুষের শরীর থেকেই, সেসবের মাংসের মধ্যে দিয়ে। তবে শুধুমাত্র খাদ্যপ্রিয় মানুষগুলোকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সঠিক হবে না। পশুপাখি, পোকামাকড়ের কেবলমাত্র ছোঁয়াছুঁয়ি পেলেই ভাইরাস-লাভ হতে পারে, একথা জেনেই এগোনো যাক। অরণ্য যখন ধ্বংস করি আমরা, না বুঝে গভীরে ঢুকে যখন বনজ সম্পদ হাতানোর 'মানবিক' কর্ম করি তখন ভিটেছাড়া হয় বহু প্রাণী। উচ্ছেদ হওয়া না-মানুষদের ভীত-সন্ত্রস্ত ছোটাছুটির সময় বেরিয়ে আসে ঝাঁকে-ঝাঁকে ভাইরাস। ঢুকে পড়ে মানব শরীরে। এভাবেই ভাইরাস

আহ্বান করে চলেছি আমরা। উদাহরণ হিসেবে প্রথমেই বেছে নেব বাদুড়দের।

বার্কলের ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার এক গবেষক দল সম্প্রতি বাদুড়ের দেহে উপস্থিত ভাইরাসের গতিপ্রকৃতি জানতে অনুসন্ধান চালান। তাঁদের গবেষণায় জানা গিয়েছে যে বাদুড়ের শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং ভাইরাসদের লড়াইয়ে বিপজ্জনক ফল হয় মানুষের মতো স্তন্যপায়ীদের জন্য। স্তন্যপায়ী প্রাণী বাদুড়ের প্রতিরক্ষা ভীষণ শক্তপোক্ত। ভাইরাসের উপস্থিতি দেখামাত্রই সক্রিয়তার চরম অবস্থায় চলে যায় এই ব্যবস্থা। ভাইরাসকে কিছুতেই প্রবেশাধিকার দেয় না কোষের মধ্যে। এই জবরদস্ত প্রতিরক্ষার প্রাচীর অতিক্রম করার লক্ষে ভাইরাসের দেহে ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ফলে ভাইরাস হয়ে ওঠে আরো মারাত্মক। দ্রুত বংশবিস্তারও করতে থাকে ভাইরাস যাতে পোষক দেহ প্রতিরক্ষা গড়ে তোলার আগেই ঢুকে পড়া যায় তার মধ্যে। কিন্তু এত সত্ত্বেও সুস্থ থাকে বাদুড়ের দল। মানুষের দেহে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আর ভাইরাসে যদি এমন মারদাঙ্গা চলত তা হলে অসুস্থ করে ফেলার মতো প্রদাহ তৈরি হত শরীরে। জ্বর হত, অন্যান্য সমস্যা দেখা দিত। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হল, বিবর্তনের মাধ্যমে প্রদাহ আটকানোর কৌশলও তৈরি হয়ে গিয়েছে বাদুড়ের শরীরে। ফলে ভাইরাস থেকে নিরাপদ বাদুড়কুল। তাদের শরীরে এসব উপসর্গ দেখা দেয় না বা বলা ভালো উপসর্গ তৈরির জীবরাসায়নিক ক্রিয়াটাই সৃষ্টি হয় না।

ঘন, গভীর জঙ্গল যখন উন্নয়নের নামে নাশ করে মানুষ তখন বাস্তুচ্যুত হয় বাদুড়রা। তাদের মল-মূত্র-লালা ক্ষরণ হয় বেশি, তার সঙ্গে খুব বেশি করে বেরিয়ে আসতে থাকে ভাইরাস। ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার গবেষকদলের প্রধান কারা ব্রুক তেমনি জানিয়েছেন। এই শক্তিশালী ভাইরাস যখন অন্য স্তন্যপায়ীর শরীরে বাসা বাঁধে তখন ফল হয় মারাত্মক। বাদুড়ের মতো নিশ্ছিদ্র প্রতিরক্ষা না থাকায় সহজেই কাবু হয় তারা। মানুষের ক্ষেত্রেও এমনই দুরবস্থা ঘটে। কোভিড-১৯ সহ বহু ভাইরাস এভাবেই এসেছে মানবশরীরে। তবে গবেষকদের অন্য একটা সিদ্ধান্তও মনোযোগ দিয়ে শোনার মতো। বাদুড়ের মধ্যে থাকা অনেক ভাইরাস কোনো এক মধ্যবর্তী প্রাণীর শরীর হয়ে তবে মানুষে পৌঁছয়। তালিকা তৈরি করে দিয়েছেন তাঁরা। সার্স এসেছে বেড়ালের মতো দেখতে এশিয়ান পাম সিভেট হয়ে, মার্স এসেছে উট হয়ে, ইবোলা গরিলা ও শিম্পাঞ্জি হয়ে, নিপা বহন করে এনেছে শুয়োরের শরীর, মারবার্গ এসেছে আফ্রিকার সবুজ বাঁদরদের দেহ হয়ে। তবে এই পথে আসার সময় ভাইরাসের শক্তি কিন্তু একটুও কমে না।

নিপা ভাইরাসের প্রকোপের কাহিনি আর একবার ঝালিয়ে নিলে পুরোটাই যে বার্কলের গবেষকদের তথ্যের সঙ্গে মিলবে এমন নয়। ১৯৯৯ সালে মালয়েশিয়ার শুয়োর চাষিদের মধ্যে প্রথম এই রোগের প্রকোপ দেখা যায়। কিন্তু তার পরে আর কিন্তু সে দেশে এই ভাইরাসের আক্রমণের কথা শোনা যায়নি। বাংলাদেশে এই রোগ দেখা যায় ২০০১ সালে এবং তারপর প্রত্যেক বছর এর আবির্ভাব ঘটছে। সন্নিহিত ভারতের পূর্ব অংশেও এর প্রকোপ দেখা গিয়েছে। ওই বছরেই অর্থাৎ ২০০১ সালে শিলিগুড়িতে নিপা ভাইরাস আঘাত হানল, স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যেও হু হু করে ছড়িয়ে পড়ল নিপা। কাম্বোডিয়া, ঘানা, ইন্দোনেশিয়া, মাদাগাস্কার প্রভৃতি দেশে এর মড়ক লাগা অসম্ভব নয় যেহেতু এসব জায়গায় ভাইরাস বয়ে নিয়ে যাওয়া বাদুড়দের অস্তিত্ব রয়েছে। মালয়েশিয়ায় যেবার নিপা ভাইরাসের আক্রমণ ঘটল মানুষের শরীরে সেবার সিঙ্গাপুরেও রোগ ছড়াল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে এর অধিকাংশটাই ঘটেছিল অসুস্থ শুয়োরের সংস্পর্শে আসায়। কিন্তু বাংলাদেশ ও ভারতে যে রোগ ছড়ানোর ঘটনা তার মূলে ছিল বাদুড়। যে সব ফল বা ফলের রসে বাদুড়ের মল-মূত্র-লালা মিশে ছিল সেগুলো মানুষের শরীরে বয়ে নিয়ে গিয়েছে ভাইরাস। আম-জামে কামড় দিয়ে বা ভালোবেসে খেজুরের রস খেয়ে অনেকে আক্রান্ত হয়েছেন নিপা ভাইরাসে। ফলে এখানে মধ্যবর্তী প্রাণীর প্রয়োজন হয়নি বলেই দেখা যাচ্ছে। কোনো উপসর্গ তৈরি না করেই মানুষের শরীরে থেকে যেতে পারে এই ভাইরাস। বাড়াবাড়ি অবস্থায় মারাত্মক শ্বাসকষ্ট অথবা প্রাণঘাতী এনকেফালাইটিস হতে পারে আক্রান্তের দেহে।

এখনও অবধি বিজ্ঞানীদের বড়ো অংশ মনে করছেন যে বাদুড় থেকেই এসেছে কোভিড-১৯। সাধারণ সর্দিকাশি ঘটানো করোনা ভাইরাসের সঙ্গে তার মিল প্রচুর। চীন জৈব অস্ত্র হিসেবে এই জীবাণু ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছিল এমন গুজব হাওয়ায় ভাসলেও তার কোনো ভিত্তি নেই। হোয়াট্সঅ্যাপ বা ফেসবুক পাঠশালার শিক্ষার্থীরা ছাড়া এসব গুজবে কেউ কান-চোখ দিচ্ছেন না। আরো যে ধন্দটা কাজ করছে তা হল কোভিড-১৯ মানুষ মারায় কতটা সক্ষম সেই তথ্য নিয়ে। বহু মানুষকে আক্রমণ করলেও শতাংশের হিসেবে মানুষ মারার দক্ষতায় কোভিড সম্ভবত সার্সের থেকে পিছিয়ে। প্রথমে যেমনটা মনে হয়েছিল সবার, তা বোধহয় সত্যি নয়। সার্সের ক্ষেত্রে মানুষের মৃত্যুর শতাংশ যেখানে আক্রান্ত মানুষের দশ শতাংশ সেখানে কোভিডের ক্ষেত্রে এই হার সম্ভবত এক থেকে দুই শতাংশে দাঁড়াতে চলেছে। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি ল্যান্সেট পত্রিকার অনলাইন সংস্করণ এমন তথ্য দেয়। তবে শেষ কথা বলার সময় এখনও আসেনি।

জীবনযাত্রার কারণে এই বিস্তার

এইডস সম্পর্কে বোধহয় নতুন কথা কেউই পড়তে চাইবেন না। তবু ঝালিয়ে নেওয়া যাক ভাইরাস বৃত্তান্তটা। শিম্পাঞ্জির শরীরে থাকা সিমিয়ান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (এস আই ভি) মানুষের শরীরে এসে হয়ে গেল এইচ আই ভি ১, ঘটাল এইডস। কিন্তু শিম্পাঞ্জির দেহে এই ভাইরাস এসেছিল বাঁদর থেকে। মাংশাসী প্রাণী শিম্পাঞ্জি, বাঁদরের মাংস খুব প্রিয় তাদের। এই মাংস থেকেই তাদের শরীরে ঢোকে ভাইরাস। দুটো ভিন্ন ধরনের বাঁদর থেকে ভাইরাস এসে হাইব্রিড হয়ে তৈরি হয়েছিল এস আই ভি। তবে ম্যাঙ্গাবে বাঁদর থেকে সরাসরি মানুষের শরীরে ঢুকেছে এইচ আই ভি, এমন ধারণাও ছিল। সেভাবেই এসে থাকতে পারে এইচ আই ভি ২। এই ১ ও ২ ভাইরাসকে আলাদা করার একটা কারণ আছে। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়েও ১ ভাইরাসের উৎস নির্দিষ্ট করা যায়নি। তবে ধারণা করা হয়েছিল যে পশু থেকেই এসেছে এই ভাইরাস। কিন্তু তখন লাইবেরিয়া থেকে একজন আক্রান্ত ব্যক্তিকে পাওয়া গেল যার শরীরে ভাইরাসের ধরন কিছু আলাদা, তাই সে ভাইরাসের সঙ্গে জুড়ল ২ সংখ্যাটা। এই ভাইরাসের ভালোরকম মিল রয়েছে সুটি ম্যাঙ্গাবে বাঁদরের দেহে উপস্থিত ভাইরাসের সঙ্গে। এই বাঁদর শিকার করে মাংস খাওয়াটা ওখানকার স্থানীয় রীতি। ফলে সেভাবে মানুষের শরীরে এইডস ভাইরাসের ঢুকে পড়া অস্বাভাবিক নয়। এতেও তেমন সমস্যা ছিল না। কোনো একটা বিচ্ছিন্ন জায়গায় পশু থেকে মানুষে ভাইরাস লাফাতেই পারে। তাতে গোটা মানবজাতি বিপন্ন হয়ে পড়ে না। কিন্তু গ্রাম থেকে শহরে চলাচল যত বাড়ল ততই ছড়াতে লাগল ভাইরাস। একবার শহরে বা তার কাছাকাছি জায়গা পাওয়ার পর দেখা গেল যে বড়ো সড়ক বা হাইওয়ে বরাবর ছড়াচ্ছে এই জীবাণু। তারপর আরো দূরে, সড়ক থেকে হাওয়াপথে, প্লেনের যাত্রীদের মাধ্যমে দেশ-বিদেশে। এই শেষ ধাপটা ছিল মারাত্মক, এইডস রোগ বিশ্বজোড়া মহামারী বা প্যানডেমিক হওয়ার পথে আর কোনো বাধা রইল না। এমনিতে এইচ আই ভি খুব দুর্বল ভাইরাস, পোষক দেহে ঢোকার পরে অনেক সময় লাগে রোগভোগ ঘটাতে, সহজে ছড়াতে পারে না। কিন্তু এত বড়ো ক্ষেত্র পেয়ে যাওয়ায় এবং মানুষের পরিবর্তনশীল আচরণ (যার মধ্যে যৌন সংসর্গই এখানে গুরুত্বপূর্ণ), তার সাহায্যে গোটা বিশ্বের ত্রাস হয়ে উঠল এইচ আই ভি। ১৯৯৫ সালে নিউইয়র্কের রকফেলার ইউনিভার্সিটির স্টিফেন মর্স এভাবেই ব্যাখ্যা করেছিলেন ব্যাপারটা, এমার্জিং ইনফেকশাস ডিজিজেসের প্রথম সংখ্যায়।

ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের বিশ্বব্যাপী বিস্তারের মূলে রয়েছে আমাদের খাবার উৎপাদনের পদ্ধতি, আমাদের চাষ-আবাদের পালটে যাওয়া ধরন। চীনে শুরু হয়েছিল হাঁস-শুয়োরের মিলিত চাষ। এর অনেকগুলো লাভজনক দিক ছিল। অলাভের মধ্যে আছে ভাইরাসের ছড়িয়ে পড়া। জলের পাখি যেমন হাঁসের মধ্যে বাসা বাঁধে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস। এর মানে অবশ্য এই নয় যে হাঁসেই কেবল পাওয়া যায় এই ভাইরাস। বিংশ শতক জুড়ে বিভিন্ন উৎস থেকে আলাদা করা হয়েছে ইনফ্লুয়েঞ্জা এ ভাইরাসকে। শুরুর দিকে পাওয়া গেল গৃহপালিত মুরগিতে, বিশের দশকে শুয়োরে, তিরিশের দশকে মানুষের মধ্যে, পঞ্চাশের দশকে ঘোড়া আর গৃহপালিত হাঁস থেকে, ষাটের দশকের শুরুতে সামুদ্রিক পাখি টার্ন থেকে এবং সত্তর দশকের মাঝামাঝি নানা জলের পাখি থেকে যার মধ্যে অবশ্যই সামুদ্রিক পাখিও রয়েছে। ভাইরাসের শরীরে থাকা আর এন এ প্রকৃতিতে কেমন তা নিয়ে বিশ্লেষণ করার সুযোগ পাওয়া গেল বিংশ শতকের শেষের দিকে কারণ তখন জিন সিকোয়েন্সিং আসতে শুরু করেছে গবেষকের হাতে। এদিকে কী হল, পঞ্চাশের দশকের শেষে এশিয়ায় এবং ষাটের দশকের শেষে নির্দিষ্ট করে হংকং-এর নাগরিকদের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ দেখা দিল। এর পরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কর্তাব্যক্তিদের আগ্রহে অনুসন্ধান শুরু হল। না-মানুষদের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের অস্তিত্ব নিয়ে খোঁজ শুরু হল যাতে মহামারীর গতিপথ বোঝা যায়। বিজ্ঞানের গবেষকরা প্রকল্প বা হাইপোথেসিস তৈরি করে এগোন। এক্ষেত্রে একটা হাইপোথেসিস তৈরি করা হল যে জলের পাখি থেকেই অন্যান্য প্রাণীতে ছড়িয়েছে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস। নেচার নামে জার্নালেও ১৯৮৮ সালে একখানা বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল এ বিষয়ে। সেখানে বলা হয় যে জলের পাখির মধ্যে ভাইরাসের ভাণ্ডার থাকলেও সরাসরি সেখান থেকে মানুষের মধ্যে ছড়ায় না ইনফ্লুয়েঞ্জা এ ভাইরাস। আগে তা শুয়োরে গিয়ে ঢোকে, সেখানে কিছু জিনগত পরিবর্তন হয় এবং তার পরে মানুষের শরীরে ছড়ানোর সক্ষমতা অর্জন করে এই ভাইরাস। আঙুল তোলা হয় কৃষি ব্যবস্থার দিকে যেখানে কখনো হাঁস এবং শুয়োর বা কোথাও তার সঙ্গে মাছ চাষও করা হয়। পাখির মল শুয়োর খাচ্ছে, শুয়োরের মল মাছের ফলন বাড়াচ্ছে, মানুষের খাদ্যের খাটতি মেটাতে ঘটে যাচ্ছে নীল বিপ্লব! খরচ নেমে যাচ্ছে চাষের পরিবর্তিত কৌশলে। কিন্তু শুয়োরের সঙ্গে এই ক্রমাগত মেলামেশা ইনফ্লুয়েঞ্জার বিকাশে অনুকূল হয়ে দেখা দেয়। চীনে তো হাঁস আর শুয়োর একসঙ্গে পালনের রীতি বহু প্রাচীন, ফলে সেখান থেকে সরবরাহ হয়েছে ভাইরাস। ১৯৯২ সালে রবার্ট

ওয়েবস্টার এবং সহযোগী বিজ্ঞানীরা যে আলোচনা শোনান আমাদের তাতে চাষবাসের ধরন নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস-বাহী বন্য হাঁসকে যেন আটকানো হয় তা বারবার বলেন তাঁরা। আয়ারল্যান্ড, আমেরিকার পেনসিলভানিয়া, অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়াতে যে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী হয়েছিল তা আটকানো যেত যদি চাষিরা তাঁদের পালিত হাঁসগুলোকে আলাদা করে রাখতে পারতেন। পোলট্রির পাশে একখানা পুকুরে হাঁস পালন করার রীতি মারাত্মক হয়ে দেখা দিয়েছে বলে গবেষকদের অভিমত। ঘরের হাঁস আকর্ষণ করে বন্য হাঁসদের। মেলামেশায় ভাইরাস আমদানি হয় দেদার। কৃষি বিভাগের কর্তারা চাষিদের কাছে আবেদন জানান যাতে এই খোলামেলা হাঁস পালন বন্ধ হয়। এতে কাজ হয়েছিল কিনা জানা নেই কারণ উৎপাদনের লাভজনক পথ কখনোই ছাড়তে চাইবে না মানুষ।

শুয়োরের দেহ ভাইরাস রূপান্তরের কারখানা। এ কথা জেনেছি আগেই। কিন্তু অনেকটা জানা দরকার। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের মোড়কের উপর দুটো পদার্থ থাকে যেগুলো শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে উত্তেজিত করে। এরা জাতে প্রোটিন এবং নামে অ্যান্টিজেন। একটার নাম হেমাগ্লুটিনিন, বোঝানো হয় ইংরেজি এইচ অক্ষর দিয়ে, আর অন্যটা হল নিউরামিনিডেজ, ইংরেজি এন অক্ষর দিয়ে সূচিত হয়। ষোলো রকম হেমাগ্লুটিনিন আর নয় রকম নিউরামিনিডেজ এখনও পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। পাখি থেকে, মানুষ থেকে শুয়োরের শরীরে এসে মেশে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস। তার নিজের শরীরের ভাইরাসও আছে সেখানে। এবার চলল রূপান্তর। কতরকম এইচ আর এনের কম্বো যে তৈরি হয়! ফলে ভাইরাসের নতুন নতুন সাব-টাইপ চলে আসে প্রকৃতিতে। কিন্তু কিছু ভাইরাস কেবল শুয়োরের দেহেই রোগ ঘটাতে পারে। প্রধান যেগুলো তা হল H1N1, H1N2, H3N2 আর, H3N1 ভাইরাস রোগ ঘটায়, কাশি-সর্দি-আলস্য-ক্ষুধামান্দ্য হয় শুয়োরদের। কিন্তু চট করে মানুষে ছড়ায় না। একেবারেই ছড়ায় না এমনও নয়, শুয়োরের সংস্পর্শে আসা চাষি পুরোপুরি নিরাপদ নয়। তবে আক্রান্ত হওয়ার হার খুবই কম। এখানে খাদ্যরসিকদের প্রসঙ্গটা ফের আনা উচিত একবার। শুয়োরের মাংস খেলে কি ভাইরাস চলে আসতে পারে শরীরে? উচ্চ তাপমাত্রায় ঠিকমতো রান্না করে খেলে শুয়োরের মাংস ভাইরাস ছড়াবে না বলেই অভিমত আমেরিকার সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশনের। তা হলে? ছড়ানোর পথ শুয়োরের হাঁচি-কাশি। হাওয়ার মধ্যে দিয়ে এই ভাইরাসের বায়ুবাহিত হওয়া। একবার মানুষ আক্রান্ত হলে তার হাঁচি-কাশি দিয়ে ছড়াতে পারে অন্য মানুষের মধ্যে। ফলে মানুষে-মানুষে মেলামেশা বন্ধ করে ভাইরাসের সংক্রমণ রোধ করাই হয়ে ওঠে প্রতিরোধের একমাত্র পথ।

পশু থেকে মানুষে ভাইরাস যত না ছড়ায় ততই ভালো। ঠিকই। কিন্তু যে ভাইরাসের এমন ছড়ানোর ক্ষমতা আছে তা যদি একেবারেই না ছড়ায় তা হলেও বিপত্তি। কেন? কারণ মাঝে মাঝে ছড়ালে মানুষের দেহে প্রতিরক্ষাতন্ত্র কিছুটা তৈরি হয়ে থাকতে পারে। আক্রমণ ঘটলে প্রতিরোধ গড়তে পারে কিছুটা বা পুরোটা। বহু দিন অবধি ছড়ানোর ঘটনা না ঘটলে উদ্বেগের কারণ ঘটে। ১৯৬৮ সালের ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর কথা বলেছি আগেই। ২০০৯ সালে জার্নাল অফ মলিকিউলার অ্যান্ড জেনেটিক মেডিসিনে ওয়েনজুন মা ও সহযোগী গবেষকরা মনে করিয়ে দেন যে H2 আছে এমন ভাইরাস ১৯৬৮-র পর আর মানবদেহে আক্রমণ চালায়নি। ফলে তৈরি নেই ইমিউন সিস্টেম। ফের যে কখন আক্রমণ চালিয়ে বিপর্যয় ঘটাবে তা গভীর আশঙ্কার বিষয়। একইরকম আশঙ্কা তৈরি হয়ে আছে বার্ড ফ্লু ভাইরাস H5N1-কে নিয়ে। ব্যাপকভাবে মানুষে ছড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে এরও। কোন কোন জায়গা থেকে ছড়ায় তা আগেই আলোচিত হয়েছে। এই গবেষণাপত্রে আর একবার আঙুল তোলা হয়েছে যে উৎসের দিকে তা হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 'ওয়েট মার্কেট'। এইসব বাজারে মানুষ-শুয়োর-হাঁস-মুরগির মেলামেশা চূড়ান্ত রকমের। জনস্বাস্থ্যের পক্ষে তা ভয়ংকর।

ম্যাজিক চাই, ম্যাজিক

অতশত জেনে কী হবে, বিজ্ঞান কী করছে! মানুষ সবরকম, সব ধরনের আচরণে লিপ্ত হবে আর বিজ্ঞানকে কিছু একটা ম্যাজিক সুরক্ষা দিতে হবে! বিশ্বজুড়ে প্রত্যাশাটা সেরকমই। তাতে অবশ্য সমস্যা নেই, বিজ্ঞান-নির্ভরতা তো চাই আমরা সবাই। কিন্তু এটা বোধহয় বৈজ্ঞানিক মানসিকতার প্রমাণ নয়। ভাইরাস আর ব্যাক্টিরিয়া এমনিতে সমার্থক, নিত্যযাত্রী থেকে মাল্টিমিলিওনেয়ার, কবি থেকে ক্রিকেটার বিশেষ ভেদ করেন না এঁদের মধ্যে। ফলে অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করেও যখন ভাইরাসের দলকে তাড়ানো যায় না তখন হতাশা, বিরক্তি ইত্যাদি নানারকম আবেগ খেলা করে তাঁদের মধ্যে। বুঝে কী হবে যে ভাইরাস ব্যাক্টিরিয়া থেকে আলাদা? জানার কী দরকার যে ভাইরাস কোষের দখল নিয়ে নেয়, ফলে ভাইরাস মারতে চাওয়া মানে কোষকেই মারতে চাওয়া? আই পি এল না দেখে শোনার কোনো মানে হয় যে শরীরের প্রতিরক্ষা তন্ত্রের জ্বর ঘটানোর অন্যতম একটা কারণ হল তাপমাত্রা বাড়ানো? বেশি তাপমাত্রায় ভাইরাস টেঁকে না জেনে কে কবে বড়োলোক

হয়েছে? এমন 'যুক্তিপূর্ণ' সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা কোনো বিজ্ঞানী বা সমাজবিজ্ঞানীর নেই। উপভোক্তার দরকার ম্যাজিক। সে ম্যাজিকের কিছুটা দিতে পারে টিকা অর্থাৎ ভ্যাকসিন। ভাইরাস ঢোকার আগে থেকেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে উত্তেজিত করে প্রতিরোধের দেওয়াল তৈরি রাখে ভ্যাকসিন। ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্য ভ্যাকসিন আছে যা প্রত্যেক বছর উপযুক্ত মরশুমে নেওয়ার সুপারিশ করেন অনেক চিকিৎসক। কিন্তু ভ্যাকসিন মানেই সম্পূর্ণ নিরাপত্তা নয়। অবশ্য তা না হলেও কিছুটা প্রতিরোধ তৈরি থাকে যদি প্রত্যাশিত ভাইরাসের আক্রমণ ঘটে থাকে। কিন্তু অন্য সাবটাইপ উপস্থিত হলে কৌশল কাজ করবে না। তখন শুরু হয়ে যাবে রোগভোগ।

পনেরোটা ভাইরাসের বিরুদ্ধে তৈরি ভ্যাকসিন লাইসেন্স পেয়েছে বাজারে আসার। শেষ যে ভ্যাকসিন লাইসেন্স পায় তা হল জরায়ুমুখের ক্যান্সার ঘটায় যে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস, তার বিরুদ্ধে। এটা ঘটে ২০০৬ সালে। তার পর থেকে আর কোনো ভ্যাকসিন আসেনি বাজারে। জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির ছড়াছড়ি সত্ত্বেও এই অনুপস্থিতি। অর্থাৎ ভ্যাকসিন তৈরিতে সময় লাগে। যত দ্রুত রোগ আসে তত তাড়াতাড়ি ভ্যাকসিন আসে না। ভাইরাসের রূপ বদলের কৌশল এর অন্যতম একটা কারণ বটে কিন্তু সেটাই একমাত্র নয়। বিজ্ঞানের এই মূলগত অক্ষমতা, বা যদি বলতে চাই বাস্তব সমস্যা— তা জেনেই তাকাতে হবে ভাইরাস ঘটিত রোগের দিকে। মানুষ থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন রাখা যতই নিষ্ঠুর শোনাক, ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার মরশুমে সেটাই হতে হবে আমাদের লড়াইয়ের কৌশল। ভাইরাস যাতে শরীরে না ঢোকে তার জন্য বারবার হাত ধোওয়াকে স্থান দিতে হবে স্বাস্থ্যকর আচরণের তালিকার উপরে। আপাতত এই আমাদের সীমিত স্ট্র্যাটেজি। যতদিন না নতুন ম্যাজিক আসছে!

নিবেদন

অনেক গ্রাহকের চাঁদা বাকি পড়ে আছে। আলাদাভাবে প্রত্যেককে মনে করিয়ে দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব ওঠে না। শুভানুধ্যায়ী গ্রাহকরা অনুগ্রহ করে গ্রাহকচাঁদা (বাৎসরিক ৭০০ টাকা) পাঠিয়ে পত্রিকার আর্থিক সংকট কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবেন এই আমাদের একান্ত নিবেদন। সহজে যাতে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে পারেন সেই জন্য আমাদের অ্যাকাউন্ট নম্বর চেয়েছেন অনেকে। নীচে নম্বরটি দেওয়া হল। অনুগ্রহ করে অনলাইনে টাকা পাঠালে গ্রাহক পরিষেবার দায়িত্বপ্রাপ্ত শ্রীরবিন মজুমদারকে ফোনে জানাবেন।

IFSC No. : UCBA0000703. Current Account : 07030210002339
(সমাজচর্চা ট্রাস্ট, ইউকো ব্যাঙ্ক, পার্ক স্ট্রিট ব্রাঞ্চ, ৭৫সি পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬।)

চেকে টাকা পাঠাতে হলে Samaj Charcha Trust-এর নামে চেক পাঠাতে হবে দপ্তরের ঠিকানায়।

—সম্পাদকমণ্ডলী
আরেক রকম

নভেল করোনা ভাইরাস— দু-চার কথা

ডা. কৃষ্ণেন্দু রায়

বর্তমান সময়ের একটি বহুল আলোচিত রোগ নিয়ে এই লেখার অবতারণা। নভেল করোনা ভাইরাস বা সিওভিআইডি ১৯। নভেল অর্থাৎ এটিকে পূর্বে দেখা যায়নি, নতুন ধরনের করোনা ভাইরাস। রোগটি প্রথম শনাক্ত হয় মধ্য চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে, ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী (২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০), এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৭,৮১৩ জন (তার মধ্যে শুধু চীনেই ৭৬,২৮৮ জন) এবং মারা গিয়েছেন (২,৩৬০ জন, তার মধ্যে শুধু চীনে ২,৩৪৫ জন)। এটি চীন থেকে জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশের বাসিন্দাদের মধ্যেও ছড়িয়েছে চীন থেকে আগত মানুষের মাধ্যমে।

এই রোগটি সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে একটু ইতিহাসের অবতারণা প্রয়োজন। এই নভেল করোনা ভাইরাস একটি RNA ভাইরাস (ভাইরাস মূলত দুই ধরনের DNA এবং RNA)। বলা ভালো, জ্ঞাত RNA ভাইরাসদের মধ্যে সর্ববৃহৎ এর চেহারা। এর আগেও করোনা ভাইরাস PANDEMIC হয়েছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ আগে তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিকারক শ্বাসনালির রোগ ধরা হত। কিন্তু ২০০২ সালে সার্স করোনা ভাইরাস (SARS— Systematic Accute Respiratory Syndrome) মহামারী প্রথম ছড়িয়ে পড়ে চীনের গুয়াডং প্রদেশ থেকে। তারপর ২৯টি দেশে তার আক্রমণে ৯১৬ জন মানুষ প্রাণ হারান। তার দশ বছর বাদে ২০১২ সালে মার্স করোনা ভাইরাস (MERS— Middle East Respiratory Syndrome) সৌদি আরব থেকে ছড়িয়ে পড়ে ২৭টি দেশে এবং সেবার ৪০০ জনের জীবনহানি ঘটে। এই পূর্ববর্তী দুটি করোনা ভাইরাস মহামারীতেই বাদুড় ছিল Natural Reservior এবং তার থেকে সার্স করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে পাম সিভেট এবং মার্স করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে উটের মাধ্যমে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে। ২০১৯ এর নভেল করোনা ভাইরাস সংক্রমণের সঠিক উৎস চিহ্নিত করা যায়নি। তবে প্রাথমিক ধারণা চীনের উহানে এই রোগের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সামুদ্রিক খাদ্য এবং পশু বাজারের নিবিড় সংযোগ আছে। এর থেকে ভাবা হচ্ছে জীবজগৎ থেকেই এই ভাইরাস মানব দেহে ছড়িয়েছে। এই ভাইরাসটির বাইরের দেওয়ালে কীলকের মতো (spike) সজ্জিত প্রোটিন থাকার দরুন এটিকে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের করোনার মতো দেখায়। তাই এর নাম করোনা ভাইরাস। বর্তমানে এটির নামকরণ হয়েছে COVID19 (CO— করোনা, VI— ভাইরাস ডিসিস, এবং 19— ২০১৯ এ ধরা পড়ার জন্য)।

এই ভাইরাসটি সম্ভবত প্রাণী থেকে প্রথমে মানব দেহে এবং পরে আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচি কাশির মাধ্যমে মানুষ থেকে মানুষে ছড়াচ্ছে। এই রোগের লক্ষণগুলি, যথা জ্বর, কাশি (মূলত শুকনো) গলা খুসখুস এবং শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি। এ ছাড়া মাথা যন্ত্রণা, গা ম্যাজম্যাজ, বমি বমি ভাব, পাতলা পায়খানাও থাকতে পারে। সাধারণ ফ্লুতেও একই জিনিষ দেখা যায়। পার্থক্য হল এই রোগে নিউমোনিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বেশি ও তার থেকে শ্বাসযন্ত্র এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিকল হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি থাকে। শিশু, বৃদ্ধ এবং যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম (মধুমেহ এবং কর্কট রোগাক্রান্ত) তাদের জটিলতার সম্ভাবনাও বেশি।

এই রোগের নির্দিষ্ট কতগুলি শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। যথা—

১। সন্দেহজনক (suspect case)— জ্বর, কাশি, শ্বাসকষ্টের রোগী যাঁরা চীন থেকে আসছেন (মূলত উহান থেকে অথবা যেখানে এই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে) অথবা এই রোগের আক্রান্তের সংস্পর্শে এসেছেন।

২। সম্ভাব্য (probable case)— সন্দেহজনক রোগী 2019corona virus পরীক্ষায় অমীমাংসীত কিংবা সমগ্র করোনা ভাইরাস পরীক্ষায় পজিটিভ (PAN Corona Virus Positive Assay)

৩। নিশ্চিত রোগী (confirmed case)— লক্ষণযুক্ত বা

বিহীন যাই হোক না কেন, যদি পরীক্ষাগারের পরীক্ষায় 2019corona virus প্রমাণিত হয়।

সন্দেহজনক রোগীর লালারস, কফ এবং শ্বাসনালির নিঃসৃত রস পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়। আমাদের দেশে এটি পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয় পুণার National Institute of Virology-তে।

যেহেতু, এই ভাইরাসের এখনও পর্যন্ত কোনো প্রতিষেধক নেই, তাই প্রতিরোধই এই রোগকে আটকানোর একমাত্র উপায়। উপায়গুলি হল— ব্যক্তিগত সুস্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে, বারবার সাবান দিয়ে হাত ধোয়া অভ্যাস করতে হবে, হাঁচি কাশির সময় মুখ ও নাক ঢেকে রাখতে হবে, একান্ত প্রয়োজন না হলে চীন বা অন্যান্য সংক্রমণ প্রবণ দেশগুলিতে যাওয়া এড়িয়ে চলতে হবে। যাঁদের হাঁচি কাশি আছে তাঁরা রাস্তাঘাটে বেরোনোর সময় মাস্ক ব্যবহার করুন যাতে আপনার থেকে অন্যের সংক্রমণ না হয়।

যদি কেউ 2019 CORONA VIRUS আক্রান্ত কোনো ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন, তবে সংক্রামিত ব্যক্তি সংস্পর্শে আসার ২৮ দিন পর্যন্ত নিজের স্বাস্থ্যের দিকে বিশেষভাবে নজর রাখুন। যদি এই রোগের লক্ষণ দেখা যায়, সত্বর নিকটবর্তী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে পরামর্শ ও চিকিৎসার জন্য যোগাযোগ করুন।

এই বিষয়ে ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশিকা হল— যদি আপনি ১লা জানুয়ারি, ২০২০-তে চীনের উহান থেকে ফিরে থাকেন বা নভেল করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে এসে থাকেন তা হলে অন্যান্যদের সঙ্গে মেলামেশা সীমিত রাখুন এবং নীচে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি মেনে চলুন।

১। ১৪ দিন গৃহবন্দী থাকুন।
২। আলাদা ঘরে ঘুমান।
৩। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সীমিত যোগাযোগে থাকুন এবং বাইরের লোক এড়িয়ে চলুন।
৪। হাঁচি কাশির সময় নাক ও মুখ ঢাকুন। কারো সর্দি কাশি বা ফ্লু-এর মতো উপসর্গ থাকলে তাকে এড়িয়ে চলুন (কমপক্ষে ১ মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন)।

অযথা আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। সাধারণ মানুষকে সাহায্য করার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে একটি কন্ট্রোল রুমও খোলা হয়েছে, যার নম্বর হল +91-11-23978046 প্রয়োজনে সাহায্য নিন।

দিল্লির বিধানসভা ভোট

গৌতম হোড়

দৃশ্যটা দেখতে দেখতে পাঁচ বছর আগের ছবি মনে পড়ে যাচ্ছিল। প্রথমে বর্তমান দৃশ্যের কথা বলি, তারপর পাঁচ বছর আগের ছবিতে যাওয়া যাবে। দাঁড়িয়ে ছিলাম চিত্তরঞ্জন পার্কের থেকে সামান্য দূরে গোবিন্দপুরির হনুমান মন্দিরের কাছে। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের রোড শো দেখব বলে। যে সময় দেওয়া হয়েছিল তা ঘণ্টা দেড়েক আগে অতিক্রান্ত। নিম্ন মধ্যবিত্ত ও গরিব এলাকা। বিকেল থেকেই জমজমাট বাজার বসে। তার মধ্যেই কেজরিওয়ালের জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে দাঁড়িয়ে প্রচুর লোক। আরো কিছুক্ষণ পরে কেজরিওয়াল এলেন। একটা হলুদ রঙা গাড়ির মাথায় বসার জায়গা। সামনে রেলিং, যা ধরে দাঁড়ানো যায়। পাশে প্রার্থীর দাঁড়ানোর জায়গা আছে। পিছনে জনা তিনেক নিরাপত্তারক্ষী। গাড়ি চলছে, পর্যায়ক্রমে দুদিকে হাত নাড়ছেন কেজরিওয়াল। চমকটা এল তার পরে। কেজরিওয়ালের গাড়ি সামনে দিয়ে চলে যাওয়ার পরই পাশে থাকা গরিব-গুর্বো লোকেরা ছুটলেন, আরো ভালো করে তাঁকে দেখার জন্য। তাঁরা কেউ দোকান ফেলে এসেছেন। কেউ জিনিস কেনা থামিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। কেউ কিছু দূরের গরিব বস্তি থেকে চলে এসেছেন তাঁকে দেখবেন বলে। তাঁরাই ছুটলেন গাড়ির পিছনে। যতটা কাছ থেকে সম্ভব, দেখার চেষ্টা আর কী।

তাঁরা ফিরে আসতে প্রশ্ন করলাম, 'এমনভাবে ছুটলেন কেন?' জবাব এল, 'ভালো করে দেখার জন্য।' আবার জানতে চাইলাম, 'দিল্লি সরকারের বিজ্ঞাপনের দৌলতে কেজরিওয়ালের ছবি তো রাজধানী জুড়ে সর্বত্র রয়েছে। আর কেজরিওয়াল তো বলিউডের তারকা নন, নরেন্দ্র মোদীর মতো মেগা-পলিটিশিয়ানও নন, তাঁকে দেখার জন্য এত আকুতি?' জবাব এল, 'যিনি আমাদের এতকিছু দিচ্ছেন, তিনি ঘরের পাশে এসেছেন, তাঁকে একবার দেখব না?' পাশে ঘিরে থাকা অন্যরাও মাথা নাড়লেন।

এই সেন্টিমেন্টের সামনে তো আর কোনো কথা হয় না। আর তাঁরা হক কথাই বলেছেন। কেজরিওয়াল দেদার দিয়েছেন। বা বলা ভালো তাঁর জনকল্যাণকারী পদক্ষেপগুলো সাধারণ মানুষের কাজে লেগেছে। বিধানসভা ভোট চুকেবুকে যাওয়ার পর লোকনীতি-সিএসডিএস একটা সমীক্ষা করেছে এবং তার ফল টুইট করে জানিয়েছে। সমীক্ষাটা খুবই কৌতূহলকর। এই সমীক্ষার প্রসঙ্গে আমরা বারবার আসব। কারণ, দিল্লির ভোটদাতাদের চরিত্র বুঝতে সুবিধা হবে। সমীক্ষায় একটা বিষয় ছিল, কেজরিওয়াল দিল্লির মানুষকে পাঁচটি জিনিস বিনা পয়সায় বা আগের তুলনায় কম টাকায় দিয়েছেন। চিকিৎসা ও ওষুধ, ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুতের বিল, জলের মাশুল, জলের বকেয়া বিল মাফ, মেয়েদের ডিটিসি বাসের ভাড়া। সমীক্ষার ফলে দেখা যাচ্ছে, জলের বকেয়া বিল মাফ ছেড়ে দিলে বাকি চারটি সিদ্ধান্তের সুবিধা দিল্লির গরিব-বড়োলোক নির্বিশেষে ৫০ শতাংশের বেশি মানুষ পেয়েছেন। ৪০ শতাংশের বেশি মানুষ জানাতে চাননি, এই সুবিধা তাঁরা পেয়েছেন কি না। ৮ শতাংশ লোক বলছেন তাঁরা কোনো সুবিধা পাননি। সেই ৮ শতাংশের মধ্যে ১৭ শতাংশ আপকে ভোট দিয়েছেন। একটা প্রকল্পে লাভবান ১৩ শতাংশের মধ্যে ৩০ শতাংশের ভোট কেজরিওয়ালের দিকে গিয়েছে। যে ২২ শতাংশ দুটি প্রকল্পে সুবিধা পেয়েছেন, তাঁদের ৪৮ শতাংশ, তিনটি প্রকল্পে লাভবান ২১ শতাংশের ভিতর ৫৪ শতাংশ, চারটি প্রকল্পে সুবিধা পাওয়া ২০ ভাগ মানুষের ৬৯ শতাংশ এবং পাঁচটি প্রকল্পের সুবিধা যে ১৬ ভাগ মানুষের কাছে পৌঁছেছে, তাদের ৭৯ শতাংশ ঝাড়ুতে বোতাম টিপেছে।

এর পাশাপাশি আরেকটা সংখ্যাতত্ত্ব দেওয়া যাক। চিত্তরঞ্জন পার্কের কে ওয়ান ব্লকের এখানে মোট ভোট ৮৯৬, ভোট পড়েছিল ৫২৫, আপ পেয়েছে ৩০০, বিজেপি ২১০, কংগ্রেস ১৫টি। এই সংখ্যাটা স্থানীয় রাজনৈতিক দলের নেতাদের কাছ থেকে পাওয়া এবং আপ ও বিজেপি নেতাদের হিসেব পুরো মিলে গিয়েছে। চিত্তরঞ্জন পার্কের এই ব্লকে মূলত মধ্যবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্তদের বাস। অবসরপ্রাপ্তদের বাদ দিলে গড় আয় মাসে ৬০ হাজারের বেশি। বাঙালির সংখ্যা ৫৫ শতাংশ,

অবাঙালি ৪৫ শতাংশ। তাঁদের কাছে দুটি প্রকল্পের সুবিধা মূলত পৌঁছেছে। ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ফ্রি, এই পর্যবেক্ষক সহ ব্লকের অনেককেই শীতের তিনমাস এক পয়সাও বিদ্যুতের বিল দিতে হয়নি। তা ছাড়া জলের মাশুলও সারা বছরে যা খুব কম দিতে হয়। আরো একটা প্রকল্পের সুবিধা কেউ কেউ পেয়েছেন। সেটা হল মহল্লা ক্লিনিক। পাঁচ মিনিটের হাঁটাপথে এই ক্লিনিকে গেলে বিনা পয়সায় ডাক্তার দেখানো, সুগার ও প্রেশার চেক করা, ওষুধ সব পাওয়া যায় এক পয়সা খরচ না করে। সেই সঙ্গে রাস্তায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর সুবিধাও আছে।

অথচ, এতকিছু সুবিধা দেওয়ার পরেও দিল্লি সরকারের রাজকোষ খালি হয়নি। বরং সিএজি রিপোর্ট বলছে, ২০১৩-১৪ থেকে ১৭-১৮ পর্যন্ত প্রতিটি আর্থিক বছরে দিল্লি সরকারের রাজস্ব বেড়েছে। রাজস্ব-ঘাটতি নয়, দিল্লিতে রাজস্ব সারপ্লাস থাকে। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়া অর্থের পরিমাণ অনেকটা কমে গেলেও দিল্লি সরকারের অসুবিধা হয় না। যেমন, ২০১৭-১৮তে দিল্লিতে রাজস্ব আদায় বেড়েছে সাড়ে বারো শতাংশেরও বেশি। কর থেকে রাজস্ব বেড়েছে প্রায় ১৫ শতাংশ এবং কর বহির্ভূত ক্ষেত্রে ১০১ শতাংশেরও বেশি। অথচ, কেন্দ্রীয় সাহায্য সাড়ে ছশো কোটি টাকা কমে গিয়েছে। এত সব তথ্য দেওয়ার কারণ, লোকের কাছে এত সুবিধা বিনি পয়সায় পৌঁছে দেওয়ার পরেও দিল্লির অর্থনীতি চাঙ্গা থেকেছে। কেজরিওয়াল অবশ্য দাবি করেছেন, এটা সম্ভব হয়েছে, সরকার দুর্নীতিমুক্ত থাকায়। এই নিবন্ধে সে বিষয়ে বিস্তারে আলোচনার সুযোগ নেই, আমরা এর মধ্যে ঢুকব না।

যে কথাটা দিয়ে শুরু করেছিলাম। কেজরিওয়ালকে শুধু চোখের দেখা দেখার জন্য পাগলামো পাঁচ বছর আগে দেখা ছবি মনে পড়িয়ে দিল। পশ্চিম দিল্লির সীমান্ত থেকে কেজরিওয়াল তাঁর রোড শো শুরু করলেন। যত সময় এগোতে লাগল, ততই ভিড় বাড়তে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে এমন ভিড় হল যে, গাড়ি আর নড়ে না। রাজনীতিতে ভিড় জোগাড় করা হয়। প্রতিটি দলই করে। প্রাপ্তির আশা না থাকলে লোকে কেনই বা সময় নষ্ট করবে। তাই ভিড় জোগাড় করতে পয়সা লাগে। দলের সংগঠন লাগে। দিল্লিতে জনসভা করতে গেলে বড়ো জাতীয় দলগুলি যে বাস ভর্তি করে হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান থেকে লোক নিয়ে আসে, তা কি আর শুধুমুধু হয়। কড়ি না ফেললে যে তেল মাখা যায় না, তা কে না জানে। গতবার কেজরিওয়ালের ওই জনসমাগম, পাগলামি ছিল অনেকটাই স্বতঃস্ফূর্ত। এবারও তার কিছুটা থেকে গিয়েছে। যে লোকেরা দৌড়ে মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে গিয়েছিলেন, তাঁরা নিজের থেকেই গিয়েছিলেন। কিন্তু কেজরিওয়ালের গাড়ির সামনে ব্যান্ডপার্টি, তাঁর পিছনে প্রায় দেড়-দুই কিলোমিটার লম্বা আপের মিছিল, টোটো, অটোতে তারস্বরে মাইকে গান, লাগে রহো কেজরিওয়াল, সে সবই হচ্ছে, ফেলো কড়ির ফল।

তা এই পাঁচ বছরে পরিবর্তন তো কম হয়নি। কেজরিওয়াল তাঁর প্রধান প্রতিশ্রুতি রেখেছেন ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি যে রাখাও হয়নি। যেমন আপ একটা প্রতিশ্রুতি জাগিয়ে শুরু করেছিল, মনে হয়েছিল, তাঁরা অন্য রাজনৈতিক দলগুলির থেকে আলাদা, সেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমবেতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ হবে। তারা আপসহীন দল, দল যৌথ নেতৃত্বের ভিত্তিতে চলবে। কিন্তু দেখা গেল, আঞ্চলিক দলের চরিত্র মেনে আপও একজন নেতার দলে পরিণত হল। যোগেন্দ্র যাদব, প্রশান্তভূষণ নেই, সন্তোষ হেগড়ে, মায়াঙ্ক গান্ধী, আশুতোষ, কুমার বিশ্বাসরা ছেড়ে চলে গেছেন বা যেতে বাধ্য হয়েছেন। আপ হয়ে গেছে শুধু কেজরিওয়ালের দল। শুধু কেজরিওয়ালের ছবি। থিম সহও মানানসই, লাগে রহো কেজরিওয়াল। ব্যক্তিপুজোর বাইরে বেরোতে পারেনি আপ। যারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল, তাদের দলের বিধায়ক, নেতারাই দুর্নীতিতে বিদ্ধ হয়েছেন। ফলে সাধারণ লোককে সাহায্য করে, তাঁদের পকেটে বেশ কিছু টাকা দিতে পেরে কেজরিওয়াল আবার বিপুলভাবে জিতেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁর দলের যে অনন্য ভাবমূর্তি ছিল, তা আর নেই।

আবার একটু সিএসডিএস-লোকনীতির সমীক্ষার কথায় আসা যাক। ২০১৫ ও ২০১৯ এর ভোটদানের মধ্যে ফারাক কোথায়? সমীক্ষা বলছে, একটিমাত্র ক্ষেত্রে আপ-এর ভোট কমেছে। সেটা হল গরিবদের মধ্যে। গতবারের তুলনায় ৫ শতাংশ গরিব আপকে ভোট দেননি। কিন্তু সেটা পুষিয়ে দিয়েছেন নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্তরা। নিম্ন মধ্যবিত্তদের ভোট ৬ শতাংশ ও মধ্যবিত্তের ভোট ২ শতাংশ বেড়েছে। বড়োলোকদের ভোট আগের বারের মতো যা ছিল তাই আছে। আর বিজেপি সবক্ষেত্রেই ভোট বাড়াতে পেরেছে। সবথেকে বেড়েছে গরিবদের ভোট। গতবারের থেকে ১২ শতাংশ গরিব বিজেপিকে বেশি ভোট দিয়েছে। কংগ্রেসের ভোট সর্বক্ষেত্রেই ৫ থেকে ৭ শতাংশ করে কমে গিয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে নতুন প্রবণতা। আর অমিত শাহ শেষ সময়ে ঠিক এভাবেই গরিব ভোট ভাঙাতে ঝাঁপিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশে ২৭০ জন সাংসদ চারদিন ধরে ঝুপড়ি-ঝুগ্গি এলাকায় পড়ে থেকেছেন। তাঁদের ভোট পাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কোনো প্রমাণ নেই, তবে গুঞ্জন আছে, দিল্লিতে ভোটের দিনে গরিব এলাকায় নাকি আকর্ষণের ধারাস্রোত বয়েছে। তা অন্যান্যবারের থেকে বেশি বই কম না।

কিন্তু গরিবদের ভোট বিজেপির বাড়াটা আপ-এর কাছে

অশনি সংকেত হতে পারে, তবে ঘটনা হল, বিজেপির প্রচারের ধারাটা এমনই ছিল যে, গরিবদের একাংশ তাতে প্রভাবিত হতেই পারেন। দিল্লিতে বিজেপির প্রচারের সেনাপতির ভূমিকায় ছিলেন অমিত শাহ। সহযোগীর ভূমিকায় ছিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি মনোজ তিওয়ারি, যিনি ভোজপুরি গান ও অভিনয়ের জগতে সুপারস্টার। ছিলেন বিজয় গোয়েল, হর্ষবর্ধন সহ রাজ্য নেতারা। ছিলেন প্রকাশ জাভড়েকর, অনুরাগ ঠাকুরের মতো নেতারা, আর ছিলেন যোগী আদিত্যনাথ সহ ভিন রাজ্যের ১১জন মুখ্যমন্ত্রী বা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রায় সব রাজ্যের নেতা। বাংলার নেতা দিলীপ ঘোষ, লকেট চট্টোপাধ্যায়রাও প্রচার করেছেন। চিত্তরঞ্জন পার্কে জনসভা করেছেন। সেখানে বিপুল সাড়া পাননি, সেটা অন্য কথা, ঘটনা হল, প্রচারে, সংগঠন দিয়ে ভোট করাবার জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি হয়নি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও দুখানা জনসভা করেছেন।

প্রথম দিকে বিজেপির আক্রমণের লক্ষ ছিলেন কেজরিওয়াল, লক্ষ ছিল তাঁর সাফল্যের কাহিনিকে মিথ্যা প্রমাণ করার প্রয়াস। তাতে কাজ না হওয়ায় তারপর চলল, পুরোদস্তুর বিভাজনের, মেরুকরণের প্রচার। দিল্লিতে বিধানসভা নির্বাচন শুরু হয়েছে ১৯৯৩ সাল থেকে। গত সাতাশ বছরে দিল্লিতে কখনো এরকম সাম্প্রদায়িক প্রচার হয়নি। শাহিনবাগকে সামনে রেখে একেবারে 'আমরা-ওরা'-র প্রচার। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সভায় গুলি মারার স্লোগান উঠল, তারপর সত্যি সত্যি গুলি চলল। সাংবাদিক শুভাশিষ মৈত্র এই ঘটনার পর বলেছিলেন, 'গান্ধিজি কতটা প্রাসঙ্গিক এখন তা বোঝা যাচ্ছে, প্রতিদিন গান্ধিজিকে মারতে হচ্ছে। গোডসের জয়ধ্বনি দেওয়া হচ্ছে, গান্ধিবাদী পথে যাঁরা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে এরকমভাবে সুর চড়াতে হচ্ছে, গুলি চালাতে হচ্ছে, গান্ধিজিকে মরতে হচ্ছে। শাহিনবাগ ঠিক না ভুল, ভালো না মন্দ, শুধু মুসলিমদের প্রতিবাদ না কি এর পিছনে অন্য কিছু আছে, প্রতিবাদ করাটাই অন্যায় কি না, সংসদ বিল পাস করলে বা সুপ্রিম কোর্ট কোনো রায় দিলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা যায় কি না, সেখানে বিরিয়ানি খাওয়া যায় কি না, বিরিয়ানি খেলে কী বোঝা যায়, এ সব প্রশ্নের মধ্যে ঢোকার দরকার নেই, এর মধ্যে অনেক প্রশ্নই অবান্তর, তবু দিনরাত উঠছে। কিন্তু এই প্রচার এমনই তীব্রতার সঙ্গে করা হয়েছিল যে, অনেক লোকের মনে হয়, দিল্লি এবার বিজেপির দখলে চলে গেল। হিন্দুরা হইহই করে পদ্মে ভোট দেবেন। বিশেষ করে যাঁর দিল্লির বাইরে থাকেন, পরিস্থিতি সরেজমিনে না দেখে তাত্ত্বিকভাবে নির্বাচনে কে হারবে, কে জিতবে নির্দ্বিধায় বলে দেন, তাঁদের মনে হয়েছিল, বিজেপি জিতছেই। এই যে বিজেপির ভোট গতবারের তুলনায় ৬ শতাংশ বাড়ল, তার অন্যতম কারণ নিঃসন্দেহে এই প্রচার।

কেন এই কথা বলছি, তার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ফলাফল যেদিন বেরোল সেদিন সন্ধ্যায় নেহরু প্লেস থেকে অটোয় চিত্তরঞ্জন পার্ক যাচ্ছি, সঙ্গী চিত্তরঞ্জন ভবনের সাধারণ সম্পাদক সিদ্ধার্থ দাশগুপ্ত। অটোতে উঠতেই চালকের মন্তব্য, 'পস্তাচ্ছে।' কে পস্তাচ্ছে? অটোচালকের জবাব, 'কেন যারা ভোট দিয়ে আপ-এর সরকার গঠন করল?' এই ভোটের ফল বেরোল, আর এর মধ্যেই লোকের পস্তানি শুরু হয়ে গেল? 'তা ছাড়া আর কী। এবার পুরো দিল্লি শাহিনবাগ হবে।' সিদ্ধার্থদা এবার জোর ধমক দিয়ে বললেন, 'এ সব আজেবাজে কথা কেন বলছেন?' একটু চুপ থেকে আবার অটোওয়ালার বক্তব্য, 'আমার একজন কাস্টমার আছেন, খুব জ্ঞানী। মনমোহন সিং-এর সহপাঠী ছিলেন। তিনি বলেছেন, ফ্রি জিনিস নেওয়া উচিত নয়।' তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওই ভদ্রলোক মনমোহনের সহপাঠী হলে সরকারি কলেজে পড়েছেন? কেন ভর্তুকি নিয়েছেন? আপনি কেন ভর্তুকি নিচ্ছেন। কেন বিদ্যুতের বিল, জলের মাশুল দেন না? আপনার স্ত্রী বা বোন সরকারি বাসে উঠলে কি টিকিট কাটেন? মোদীজি যে কৃষকদের বছরে ছ হাজার টাকা করে দিচ্ছেন, তা কৃষকরা নিচ্ছে না? এমন ভুল কাজ মোদীজি কেন করলেন?' এরপর তাঁর মুখ বন্ধ হল। প্রত্যেক ভোটে কেউ একজন জেতে বা হারে। কিন্তু এতদিন দিল্লিতে মেরুকরণের এ হেন প্রয়াস হয়নি। এবার সেই প্রয়াস ভবিষ্যতে কি প্রভাব বিস্তার করবে?

এর জবাব ভবিষ্যৎ দিতে পারবে, আমরা আবার একটু লোকনীতি-সিএসডিএস সমীক্ষার দিকে তাকাই। সমীক্ষা বলছে, হিন্দুদের ভোটের ক্ষেত্রে ৪৮ শতাংশ পেয়েছে আপ ও ৪৬ শতাংশ বিজেপি। মুসলিমদের ক্ষেত্রে আপ পেয়েছে ৮৩, বিজেপি ৩ ও কংগ্রেস ১৩ শতাংশ। ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বৈশ্য, পাঞ্জাবি ক্ষত্রি, অন্য উচ্চবর্ণ, জাঠ, গুর্জর ভোট আপের থেকে বেশি পেয়েছে বিজেপি। আর বাল্মিকী, অন্য দলিত, অনগ্রসর, শিখ, যাদব ভোট আপ অনেক বেশি পেয়েছে। লোকসভার ক্ষেত্রে দশজন যদি বিজেপিকে ভোট দিয়ে থাকেন, তা হলে এ বার তার মধ্যে চারজন আপের দিকে চলে গিয়েছেন। আরেকটি উল্লেখযোগ্য তথ্য, ব্রাহ্মণ, রাজপুত, জাঠ, গুর্জর, দলিত, ক্ষত্রি, বৈশ্য পর্যন্ত সব জাতের মহিলারা আপকে বেশি ভোট দিয়েছেন। পুরুষরা বিজেপির দিকে কিঞ্চিৎ হেলে থাকলেও মহিলারা কেজরিওয়ালকে বেছে নিয়েছেন। এর কারণ হতে পারে, কেজরিওয়াল যে সংসারের খরচ বাঁচিয়ে দিয়েছেন, তাতে তাঁরা কৃতজ্ঞ। তিনি যে মেয়েদের বাসযাত্রা ফ্রি করে দিয়েছেন এবং বাস মার্শাল নিয়োগ করে তা নিরাপদ করেছেন, সে জন্যও তাঁরা কৃতজ্ঞ, আর কেজরিওয়াল যে মেট্রো সফরও মেয়েদের জন্য ফ্রি করার চেষ্টা করেছিলেন, তার জন্যও

কৃতজ্ঞতা থাকতে পারে। মোদ্দা কথা মেয়েদের দরাজ সমর্থন তিনি পেয়েছেন। এবার প্রতিশ্রুতিমতো মহল্লা মার্শাল নিয়োগ করলে এলাকাও মহিলাদের জন্য আগের থেকে নিরাপদ হতে পারে।

গত পাঁচ বছর ধরে কেজরিওয়ালকে ঠেকাতে বিজেপি তাঁকে থামানোর চেষ্টা করে গিয়েছে। রাজ্য সরকারের অনেক সিদ্ধান্তই লেফটেনান্ট গভর্নরের ছাড়পত্র পায়নি। বিধানসভায় পাস হওয়া অনেক বিলেই সম্মতি দেওয়া হয়নি। এমনকী কেজরিওয়াল যে বিদ্যুৎ, জল, বাসে ছাড় দিচ্ছেন, তা নিয়েও বিদ্রূপ করা হয়েছে। আবার দিল্লি জিততে বিজেপিও শেষ পর্যন্ত কেজরিওয়ালের সব ফ্রি জিনিস চালু রাখার কথা বলেছে। তাতে আর যাই হোক, লোকের মনে বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি হয়নি।

রাজনীতিতে পারসেপশন বড়ো কথা। পারসেপশনের লড়াইয়ে কেজরিওয়ালের কাছে হেরে গেছে বিজেপি। দিল্লি আবার দেখিয়ে দিয়েছে, তারা লোকসভায় একভাবে ভোট দেয়, বিধানসভায় ভোটদানের রীতি বদলে যায়। আর দিল্লি মানে তো মিনি ভারত। তার মানে কি এই প্রবণতা এবার অন্য রাজ্যেও দেখা দিতে পারে? কেজরিওয়ালের জয়ের মধ্যে আরেকটা বার্তাও আছে, লোকের পাশে থাকলে তারাও পাশে থাকবে। কথাটা অনেকটা মহাপুরুষের বাণীর মতো মনে হলেও দিল্লির নির্বাচন তো এই বার্তাই দিয়েছে।

পরিশেষে কংগ্রেস নিয়ে একটা কথা বলা দরকার। লোকসভার সময় কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করতে চেয়েছিলেন কেজরিওয়াল। রাহুল গান্ধি করেননি। তার ফলে দিল্লিতে দলটাকে তুলেই দিলেন সনিয়া-তনয়। পনেরো বছর কংগ্রেস দিল্লি শাসন করেছে। দিল্লিকে আধুনিক করা, গরিবদের সাহায্য করা, ঝাঁ চকচকে শহরে পরিণত করার সিংহভাগ কৃতিত্ব শীলা দীক্ষিত দাবি করতেই পারেন। সেই কংগ্রেস এখন দিল্লিতে একেবারেই প্রভাব প্রতিপত্তিহীন রাজনৈতিক দল। তার সব ভোট নিয়ে নিয়েছেন কেজরিওয়াল। কংগ্রেসের আপাতত দিল্লিকে আর কিছু দেওয়ার নেই।

মা এবং ফাঁসি

প্রতিভা সরকার

কথা হচ্ছে শাহিনবাগের সন্তানহারা মা-টিকে নিয়ে। তুমুল কথা। কেউ যদি শিশুকে পিঠে বেঁধে যুদ্ধরত ঝাঁসির রানি লক্ষ্মী বাইয়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্যরা ছিছিক্কারে ভরিয়ে দিয়েছেন। মাতৃত্বের কলঙ্ক ইত্যাদির সঙ্গে পুতখাকির মতো উনিশ শতকীয় গালি ছোঁড়া হচ্ছে তার দিকে। অথচ এই বিবেচনা নেই যে সন্তানপালনে পিতা ও পরিজনদেরও ভূমিকা থাকে। এই মেয়েটি হয়তো ঘরের সে সুবিধা বঞ্চিত। কিন্তু বে-ঘর হবার আতঙ্ক তাকে রাতের পর রাত শাহিনবাগে বসিয়ে রেখেছে। দেওয়ালে পিঠ-ঠেকা মানুষ, তবু তো সে পাথর ছোঁড়েনি বা বোমা বাঁধেনি। গণতান্ত্রিক এবং অহিংস প্রতিবাদের রাস্তা বেছে নিয়েছে। ডিটেনশন ক্যাম্পে তাকে পাঠিয়ে দিলেও সন্তানের সঙ্গে বিচ্ছেদ অনিবার্য ছিল। যাতে তা না ঘটে সেই চেষ্টায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকেও সে সেই বিচ্ছেদ এড়াতে পারল না, এমনই ভাগ্যের পরিহাস।

আমরা যারা ঘর বাহিরকে মেলাবার ব্যর্থ চেষ্টায় জীবনের অনেকটা সময় নষ্ট করেছি, তারা ভালো করেই জানি শিশুর পীড়ার মাত্রা অনেকসময় ডাক্তারও সহজে ধরতে পারেন না। একটুতেই তা হাতের বাইরে চলে যায়। এই মা-টির ক্ষেত্রেও ঠিক তাইই ঘটেছিল। আগের রাতে কোনো অস্বাভাবিকতা নজর না করলেও পরদিন ভোরে নিজের বিছানাতেই তিনি সন্তানের মৃতদেহ আবিষ্কার করেন।

আবার ওদিকে অসমে ডিটেনশন ক্যাম্পে দুটি কোলের শিশুর মৃত্যু হয়েছে। স্বাভাবিক, কারণ এই ঠান্ডায় পারিবারিক এবং চিকিৎসার সুবিধাবর্জিত পরিবেশে আতঙ্কগ্রস্ত মন নিয়ে একাকী মা আর কীই বা করতে পারেন। কিন্তু আশ্চর্য লাগে, এতবড়ো দেশে এই শিশুমৃত্যু নিয়ে, যার জন্য পুরোপুরি দায়ী এই রাষ্ট্র, তা নিয়ে কারো কোনো হেলদোল নেই। মাকে দায়ী করেই যেন সব কর্তব্য শেষ হয়।

আসল কথা তা নয়, প্রতিবাদী এই মাকে নিষ্ঠুর সাজালে গোটা আন্দোলনটিকেই বেইজ্জত করা যাবে ভাবছেন কেউ কেউ। আর কেনই বা ভাববেন না, আমাদের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং শাহিনবাগকে পাকমদতপুষ্ট সন্ত্রাসী সমাবেশ আখ্যা দিয়ে এই যা খুশি বলা যায়-এর রাস্তা খুলে রেখেছেন। মায়ের করুণাঘন ইমেজ থেকে মেয়েদের একটুও হেলবার উপায় নেই, তা হলেই ধেয়ে আসবে পিতৃতন্ত্রে ছিছিক্কার, অথচ রাষ্ট্রের আধিপত্যবাদকে কায়েম রাখবার জন্য, ভোটের রাজনীতিতে সুবিধা পাবার জন্য বেমালুম অস্বীকার করা যেতে পারে রাধিকা ভেমুলা ও ফতেমা বেগমের মতো আরো দুই সন্তানহারা মায়ের সঠিক তদন্তের ন্যায্য দাবি। আবার চূড়ান্ত মর্মন্তুদ ঘটনার মধ্য দিয়ে যাওয়া বেদনাতুর মাতৃহৃদয়কে ব্যবহার করে বর্বর প্রথা মৃত্যুদণ্ডকে হাসিল করে বেশি ভোট কুড়োবার খেলায় ব্যস্ত হয়ে পড়তে পারে রাজনৈতিক দলগুলি। দুখানেই বাজির দান মা আর মায়ের সঙ্গে চিপকে দেওয়া কল্পিত গুণাবলি।

(২)

কেউ ব্যক্তিগতভাবে মৃত্যুদণ্ডকে মান্যতা দেয় কি না, দিয়ে কতটা ন্যায় বা অন্যায় করে সেটা এখানে প্রতিপাদ্য নয়। প্রমাণ করার দায় এইটে, যে এই বর্বর প্রথা অধুনা তুমুল বলশালী ভারতমাতার ধারণার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে এক গভীর রাজনৈতিক চক্রান্তের অঙ্গ হিসেবে। অথচ ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে উঠে আসা এই মাতৃস্বরূপিণীকে কিন্তু কোথাওই রক্তলোলুপা হিসেবে চিত্রিত করা হয়নি। কিরণচন্দ্র ব্যানার্জির ভারতমাতা (১৮৭৩) বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত এক তুখোড় নারী, যার অভীষ্ট সাধারণের মুক্তি, কিন্তু কখনোই প্রাণের বিনষ্টি নয়। বঙ্কিমের আঁকা মাতৃমূর্তি ভারতবর্ষের নাকি শুধু বঙ্গের সে বিতর্ক নতুন করে চাগিয়ে উঠলেও একথা বলাই যায় যে সে মূর্তি সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলিমার বর প্রদায়িনী। অবনীন্দ্রনাথের ভারতমাতাও স্নেহমতার প্রতিমূর্তি, তাঁর চার হাতে তিনি বিতরণ করে চলেছেন শিক্ষা দীক্ষা অন্ন বস্ত্র।

অথচ ইদানীং প্রতিশোধপরায়ণতাকে মা-সুলভ গুণাবলির অন্যতম বলে চিত্রিত করা হচ্ছে এবং ধন্য ধন্য রবে ঢক্কানিনাদ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সারা দেশে। যেখানে রাস্তাঘাটে আলোর

ব্যবস্থা, গ্রামাঞ্চলে শৌচাগারের ব্যবস্থা করলেই অনেক মেয়ে যৌনলাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচে, সেটুকুই সরকার বাহাদুর করে উঠতে পারে না। নির্ভয়া ফান্ডের টাকা খরচ না হয়ে পড়ে থাকে। ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট স্বপ্ন হয়েই থাকে, আর জঘন্য অপরাধের বিচার সাত বছরেও শেষ হয় না। অথচ এই পদক্ষেপগুলিই পারত দেশে ধর্ষণের সংখ্যা কমাতে, মৃত্যুদণ্ড যে তা পারে না তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। এইসব না করে সরকারি মদতে ধর্ষণে অভিযুক্তদের এনকাউন্টার করে মারা হয়। তাতে ভারতমাতার সম্মান এতই বাড়ে যে খুশি পুলিশের মাথায় নাগাড়ে পুষ্পবৃষ্টি হয় এবং সরকারের দণ্ডদাতা হিসেবে ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার হয়।

তাও হায়দ্রাবাদের হতভাগ্য মেয়েটির মা বাবা কোনো প্রকাশ্য বয়ান দেননি। কিন্তু যার নির্মম মৃত্যু দেশের বিবেককে সজোরে ঝাঁকিয়ে দিয়েছিল সেই নির্ভয়ার মা প্রায় দুবেলা ধর্ষকদের ফাঁসি চেয়ে মিডিয়াতে আসছেন, কান্নাকাটি, অভিসম্পাত করছেন। তাঁর পক্ষে এই প্রতিক্রিয়াই স্বাভাবিক, সন্তানকে কোনো পিশাচ কেড়ে নিলে প্রথম প্রথম সব মায়েরই এই প্রতিক্রিয়াই হবে। কিন্তু সাত বছরে বন্দী দশায় অকথ্য যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে এক অপরাধী আত্মহত্যা করেছে, বা তাকে খুন করা হয়েছে।? অন্য বন্দীদেরও একই দশা। উপরন্তু আজ গলায় ফাঁসির দড়ি ঝুলবে, নয়তো কাল, দীর্ঘকাল এই টেনশন সহ্য করা মৃত্যুযন্ত্রণারও অধিক একথা সব মনস্তত্ত্ববিদরাই বলেছেন। নিজের প্রিয়জনকে হারিয়েও হন্তারককে ক্ষমা করে দেবার দৃষ্টান্ত ধর্মগ্রন্থে, মহাজনদের বাণীতে তো বটেই, বাস্তব জীবনেও অনেক রয়েছে। সবার আগে যাঁর কথা মনে আসে তিনি সনিয়া গান্ধি। স্বামীর নিষ্ঠুর মৃত্যুর পরও দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তামিল আতঙ্কবাদীদের ক্ষমা করেছেন। প্রবীণ আইনব্যবসায়ী ইন্দিরা জয়সিং সেকথা মনে করিয়ে দিতে গেলে আশাদেবী তাঁকে এই বলে ধিক্কার দেন যে তাঁর মতো আইন ব্যবসায়ীর জন্যই এদেশে ধর্ষকদের এত রমরমা। গণতান্ত্রিক দেশের আইনি রীতিনীতির তোয়াক্কা না করে এই ত্বরিত ফাঁসির জন্য আবদার যে অন্যায়, অনৈতিক তা বলার সাহস কারো নেই। কিছু বলতে গেলেই ধেয়ে আসবে ভর্ৎসনা, নিজের সঙ্গে না হলে আর বুঝবেন কী করে। যেন এই অসাংবিধানিক আবদারের সাপোর্টারদের প্রত্যেকের এই অবমাননা, এই নৃশংসতার প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে। সরকার ও অন্য রাজনৈতিক দলগুলোও ভোটের কারণে এতে তোল্লাই দিচ্ছে। বিজেপি বলছে আম আদমি পার্টির কারণে ধর্ষকদের ফাঁসি দেওয়া যাচ্ছে না, আপ বলছে দুদিনের জন্য দিল্লি পুলিশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে ফাঁসি দিয়ে তারা দেখিয়ে দিত। মাঝখান থেকে আশাদেবী রাজনৈতিক পাশা খেলার ক্রীড়নকে পরিণত করছেন নিজেকে। মাতৃহৃদয়কে তুলে দিচ্ছেন ক্ষমতার কারবারিদের নোংরা হাতে যাতে তার ওপর ভর করে তারা জিতে যায় ভোটখেলায়।

(৩)

তবে এদেশে ধর্মের কাহিনি বলে কোনো কালেই কোনো লাভ হয়নি। মানুষের হিংসা সবচেয়ে তুখোড়, সবচেয়ে ধারালো হয় যখন সে যূথবদ্ধ। হতে পারে ভিড়ে একক মুখ দেখা কঠিন হয় বলে লজ্জা, ভয়, বিবেকযাতনা সবই কম কম হয়। জনসমর্থন পেলে এদেশে তুলে নিয়ে গুলি করে মারাও জায়েজ হয়। আমরা শুধু বলে যেতে পারি কেন হিংসা, বিনা বিচারে এনকাউন্টার বেআইনি, ফাঁসি অমানবিক। কিছু অপরাধী, যারা নিচুতলার মানুষ, যারা কখনো মানুষের মতো বেঁচে থাকবার শিক্ষা, পরিবেশ কিছুই পায়নি, তাদের জিয়ল মাছের মতো জিইয়ে রাখা হয়েছে প্রলম্বিত বিচারের ফাঁদে। জেলের ভেতর টিভি চলে, খবরের কাগজ যায়। তারা দেখছে অমুন দিন তাদের ফাঁসি দেওয়া হবে। আবার আইনি জটিলতায় সে দিন পিছিয়ে যাচ্ছে। এই টানাপড়েন কি ভয়াবহ নয়? কাগজে ফলাও করে লেখা হচ্ছে ফাঁসির মোটা দড়ি ও জল্লাদের ইতিবৃত্ত। কী করে কলা মাখিয়ে মসৃণ করা হয় সে দড়ি, কীভাবে পাকিয়ে পাকিয়ে গিঁট দেওয়া হয়, ভোররাতে ঠেলে তোলা হয় আসামিকে, তারপর স্নান পূজাপাঠ, ভালোমন্দ খাইয়ে ঠিক বলির পাঁঠার মতো ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাওয়া হয় ফাঁসির মঞ্চের দিকে। তথ্য হিসেবে জানা এককথা আর নিজের ওপর এগুলো হতে যাচ্ছে এই উপলব্ধি আর এক কথা। কেউ রাস্তাটুকু যেতে যেতে চিৎকার করে নিজের নির্দোষিতার কথা জানান দেয়, কেউ বিহ্বল হয়ে কাঁদতে থাকে, কেউ ফাঁসির দড়ি গলায় এঁটে বসার আগে অজ্ঞান হয়ে যায়। তারপর শ্বাসনালিতে প্রবল চাপে কারো ঘাড় ভাঙে, পা বেয়ে গড়িয়ে নামে দুর্গন্ধ মলের ফোঁটা। সেইটি দেখেও নিশ্চিত হওয়া যায় না, তাই আধ ঘণ্টা অন্ধকার গর্তে দড়িতে নড়বড়ে গলা ঝুলিয়ে সে আধ ঘণ্টা দোল খায়। তবে মৃত্যুদণ্ডের বৃত্তটি সম্পূর্ণ হয়।

অপরাধী হলেও মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত মানুষটি তো মানুষ, মানুষী প্রবৃত্তিগুলি তার তো থেকেই যায়। এই প্রবল মানসিক চাপ সহ্য করা কি সহজ কথা। তাকে এইভাবে খুন করে সমাজ ও রাষ্ট্র কি নিজেকে অপরাধীর সমপর্যায়ভুক্ত করে ফেলে না?

নির্ভয়ার অপরাধীদের অপরাধ প্রমাণ হয়েছে, কিন্তু অনেক কেস তো এমন আছে যেখানে অপরাধ প্রমাণে ফাঁক নয়, বড়ো গহ্বর আছে। যেমন এরাজ্যে ধনঞ্জয়ের ফাঁসি। বিরলের মধ্যে বিরলতম নয় কি নিঠারি কেস, যেখানে ধর্ষণের পর শিশু কিশোরীদের মৃতদেহের মাংস খাওয়া হয়েছিল। মূল

সন্দেহভাজন অপরাধী সমাজের উঁচুতলার লোক। তার ফাঁসি হয়নি তো, তার সহযোগীরও নয়। বীণা রামানির রেস্তোরাঁয় সরাসরি কপালে গুলি চালিয়ে মেরে ফেলা নারীঘাতী ক্ষমতাশালীটি তো দিব্যি প্যারোলো মুক্ত থেকে থেকে বন্দিদশা প্রায় শেষ করে আনল। তার বেলা? ফলে নিচুতলার অপরাধমনস্কতাকে আমরা বড়ো করে দেখি, স্বশ্রেণির বেলায় চোখ বোজা, একথা কি খুব ভুল?

মোদ্দা কথা হচ্ছে এই অমানবিক অসভ্য পদ্ধতিটির প্রতি ব্যক্তিগত প্রতিশোধস্পৃহায় কারো আমূল পক্ষপাতিত্ব থাকতেই পারে। কেন আছে তা বোঝা, সেই কারণের প্রতি এমনকী সহানুভূতিশীল হওয়াও অসম্ভব নয়, কিন্তু তার ওপর ভর করে ফায়দা লোটা বা মৃত্যুদণ্ডকে পবিত্র পরিণাম হিসেবে দেখাবার যে চেষ্টা আধিপত্যবাদীরা করছে তা দক্ষিণপন্থী বিষময় প্রচার কৌশলের অঙ্গ হয়ে উঠছে। নির্ভয়ার মায়ের ব্যক্তিগত ক্রোধ বিজেপি ভোটাস্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। তাতে সুচতুরভাবে জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে মাতৃত্বের ধারণা, ভারতমাতার অনুষঙ্গ। মা হো তো অ্যায়সা, এই বুজকুড়িতে নিরপেক্ষ স্বচ্ছ ভাবনা ঘেঁটে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। শাহিনবাগের মা, রাধিকা বা ফতিমা মা পদবাচ্য হবেন কি না সন্দেহ জাগিয়ে লাগামছাড়া প্রতিশোধস্পৃহাকে আইনি রূপ দেবার, নিজের স্বার্থে ব্যবহার করবার এই প্রবণতা কখনো জনজীবনের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হতে পারে না। চিন্তার কারণ সেটাই। ফলে নির্ভয়ার ধর্ষকদের ফাঁসি যদি ইতিমধ্যে হয়েও যায় তবুও চিন্তাভাবনার কারণ কিন্তু রয়েই যাবে।

অথ টোলরহস্যকথা ও একটি অমীমাংসিত প্রশ্ন—১

দেবোজ্যোতি গঙ্গোপাধ্যায়

[গত ২০১৮ জুনে আনন্দবাজার পত্রিকার post editorial-এ দুই কিস্তিতে (শেষ কিস্তি ৩০ জুন) বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের ভূতপূর্ব সচিব অতনুশাসন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন কীভাবে টোল চতুষ্পাঠী বাহিত শিক্ষার ঐতিহ্য বাঁচানো যায়।

আমি নিজেও ব্যক্তিগতভাবে এই প্রশ্নে দীর্ঘদিন ধরে আগ্রহী, যদিও আমার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ লেখা সেই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিকে বিস্তারিত করার জন্য।]

১: পুরানো সেই দিনের কথা

অতনুশাসন মুখোপাধ্যায়ের এ লেখা[১] পড়ে প্রথমেই যেটা মনে পড়ে গেল সেটা হল প্রায় দেড়শো বছর আগে সংস্কৃত কলেজের সে সময়কার অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের টোল চতুষ্পাঠী শিক্ষার নবরূপায়ণ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব—

মহেশচন্দ্র লিখেছিলেন—

"I may even mention that the sanskrit college itself can by no means claim to impart that deep knowldege of Sanskrit which to Tols do.

The instruction imparted in this institution is more of a philological nature and it seeks to give an education embracing both Western and Eastern culture. The Tols however teaching Sanskrit alone in all its higher departments are best calculated to produce scholars with deep knowledge of sanskrit."

(Letter from the principal, Sanskrit college, to the D.P.I, 9th February 1885)

এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে, ততদিনে টোল চতুষ্পাঠী শিক্ষার সার্বিক চিত্রের দ্রুত অবনতি শুরু হয়ে গেছে। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে উইলসন সাহেব নদিয়া পরিদর্শনে গিয়ে নবদ্বীপে ২৫টি টোল ও ৫০০ ছাত্র ছিল বলে জানাচ্ছেন। ৩৫ বছর পর ই বি কাওয়েল এই নবদ্বীপেই দেখেন মাত্র ১২টি টোল ও ১৫০ ছাত্র!! এই অবস্থার উন্নতির জন্য কাওয়েলের প্রস্তাবগুলো ছিল—

১. টোলের ছাত্রসংখ্যা হ্রাস রোধের জন্য রেগুলার গ্রান্ট-এর ব্যবস্থা।

২. প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষার সহিত অঙ্কশাস্ত্র, ভূগোল, ইতিহাস, প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এবং তজ্জন্য শিক্ষক নিয়োগ।

৩. যোগ্যতম পরিদর্শকমণ্ডলী গঠন।

৪. মাঝে মাঝে সাময়িক পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি প্রবর্তন

১৮৮৩ সালে মহেশচন্দ্র প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার Edger-এর অনুরোধে নদিয়া ও ভাটপাড়ার টোলের অবস্থার (আসলে দূরবস্থার।) যে তথ্য পেশ করেন তাতে সমগ্র নদিয়ায় ছাত্রসংখ্যা ১১৮ বলে জানান, টোল ১৩টি।

সুতরাং টোলের ছাত্রসংখ্যা কমছিল হু হু করে। আজ থেকে দেড়শো বছর আগেও!

অবশ্য টোলে ছাত্রসংখ্যার এই শীঘ্রপতন পলাশির যুদ্ধের পর (১৭৫৭) একরকম অনিবার্যই ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র বা নাটোরের রানি ভবানীর মতো মাপের যে রাজা জমিদাররা এতকাল হিন্দুর উচ্চশিক্ষার সবরকমের পৃষ্ঠপোষণা করে এসেছিলেন, পলাশীর যুদ্ধের পর আর্থ সামাজিক উথালপাথালে তাঁরা সবাই ক্ষমতাহীন নিধিরাম সর্দার হয়ে উঠছিলেন। সে সময়ের ইতিহাসের যে-কোনো শুরুর পাঠকও জানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯১) ধাক্কায় বড়ো বড়ো জমিদারি কীভাবে নিলাম হয়ে যাচ্ছিল। বঙ্কিম অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন.... ''নামমাত্র চিরস্থায়ী, চিরস্থায়ী দূরে থাক কাহারও জমিদারী ক্রমান্বয়ে চার বৎসর স্থায়ী হইত না।'' খুব সোজাসাপটা স্বীকারোক্তি!

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল এক বহুচর্চিত বিষয়। ইতিহাসের ছাত্ররা সম্ভবত পরীক্ষায় আজও এর উপর দু-একটা প্রশ্ন আশা করে।

কিন্তু এই (অ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরোক্ষ প্রভাব যেভাবে বাংলার উচ্চশিক্ষায় পড়েছিল সে নিয়ে কথা কমই বলা হয়। পলাশির ঠিক পরবর্তী সে সময়টা যদিও বহুচর্চিত মূলত ঐতিহাসিকদের লেখায়, কিন্তু সে সময় টোল শিক্ষাধারার শেষ প্রহর ঘনিয়ে আসার ও সেই সূত্রে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের

প্রায় বৃত্তিহীন চাটুকারে পরিণত হবার আলোচনা প্রায় চোখেই পড়ে না।

এ সময়টায় অলিগলি, বাঁক আর কলকাতার ব্রাহ্মণপণ্ডিত সমাজ হুতোমের বর্ণনায় উদোম ন্যাংটা হয়ে ধরা পড়ে। সেই দগদগে উদোম সময়ের বর্ণনায় হুতোম কী বলছে দেখা যাক—

''পাঠক! নবাবী আমল শীতকালের সূর্য্যের মত অস্ত গ্যালো। মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরাজদের প্রতাপ বেড়ে উঠল। বড় বড় বাঁশঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো। কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগল। নবো মুনসী, ছিরে বেণে ও পুঁটে তেলি রাজা হলো। .... টাকা বংশগৌরব ছাপিয়ে উঠলেন। রামা মুদ্দফরাশ, কেষ্টা বাগদী, পেঁচা মল্লিক ও ছুঁচো শীল কলকাতা কায়েম বামুনের মুরুব্বী ও সহরের প্রধান হয়ে উঠলো।''[২]

হুতোমের বর্ণনার এই নবো মুনসী, টীকাকার অরুণ নাগ জানাচ্ছেন, ''রাজা নবকৃষ্ণ দেব (১৭৩৩?-১৭৯৭ খ্রি), প্রকৃত পদবী কুণ্ডু। আরবী, ফারসি ও ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত। ওয়ারেন হেস্টিংসের ফারসী ভাষার শিক্ষক। সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার যে ষড়যন্ত্র হয় তার সকল লেখাপড়া তাঁর দ্বারাই হয়েছিল।''[৩]

সুতরাং পলাশির পরের বদলাতে থাকা সময়ে পেশায় টিকে থাকার জন্য এ হেন নবো মুনসী, রামা মুদ্দফরাস, ছিরে বেনেদের দরজায় হত্যে দেওয়া (নিন্দুকের ভাষায় মোসাহেবি বা নির্লজ্জ চাটুকারিতা) ছাড়া টুলো পণ্ডিত বামুন সম্প্রদায়ের আর কোনো পথই খোলা ছিল না। কারণ পড়া, পড়ানো, পৌরোহিত্য করার মতো কয়েকরকম মাত্র কাজ ছাড়া আর তো কিছু করতে তারা শেখেইনি এবং সামাজিক ভাবে তাদের সে অনুমতিও নেই। আজ যেমন যে যা খুশি করতে পারে, বামুন, কায়েত, বদ্যি, মুচি, মুদ্দফরাস তেমনটা এই সেদিনও উনিশ শতকের শুরুতে বা পরেও অকল্পনীয় ছিল! অগত্যা পুরুষানুক্রমিক টোল বাঁচাতে ও নিজেদের বাঁচাতে কোনো পথই তাদের জন্য খোলা ছিল না, এই 'কঞ্চিতে বংশলোচন' বা নতুন ধনীদের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া।

সে সময়ের কলকাতা ও আশপাশের অবস্থাটা বোঝাতে সেই হুতোমের 'নকশা' বা টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলালই' প্রায় শেষ কথা। বড্ড ন্যাংটো সত্যকথা, কিন্তু অস্বীকার করার জায়গা নেই যে, ঊনবিংশের কলকাতা মশা মাছি, ম্যালেরিয়ার ডিপো হলে কী হয়, দলাদলির ব্যাপারে, হুতোম বা টেকচাঁদ পড়লে ঠিক আজকের মতোই লাগে। এক-দেড়শো বছরের ইতিহাসটা স্রেফ গায়েই লাগে না!

এই ঘোর একবিংশে Smart Phone, Face book যুগে তথ্যের ভাঁড়ার ফুলে ফেঁপে উঠলেও দলাদলির প্রশ্নে বাঙালির যে বিশেষ ইতরবিশেষ হয়নি সেটা হুতোম পড়লে মনে না হয়ে উপায় নেই। হুতোমের টীকাকার অরুণ নাগ মশায়ের টীকাকেই আবার আশ্রয় করি— ''সে যুগের কলকাতায় দলাদলি ছিল হিন্দু সমাজের অবিচ্ছেদ্দ অঙ্গ। প্রয়োজনানুযায়ী শাস্ত্রে বিধান দেবার জন্য একদল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাঁরা পুষতেন।''[৪] বলাই বাহুল্য যে এইসব পোষ্য বৃত্তিভোগী বামুন পণ্ডিতরা 'নতুন বংশলোচনদের' খুশি রাখতে কোনো কসুর করতেন না।

জীবনধারণ বড়ো বালাই এবং সে বালাই-এর দায় পলাশি-পরবর্তী বাংলার সমাজের নানা সম্প্রদায় নানাভাবে হাড়ে হাড়ে চুকিয়েছিল।

কিন্তু আরেকটা বিষয় মনে রাখার যে, শিক্ষাক্ষেত্রে এ শুধু কেবলমাত্র যুদ্ধ পরবর্তী সাময়িক অস্থিরতাই ছিল না, কারণ ততদিনে ভাঙতে থাকা বাংলার সমাজের শহর বাজারে বিকল্প শিক্ষার model-গুলোও আসতে থাকছে। যে সময়টায় উইলসন, কাওয়েল, মহেশচন্দ্র হন্যে হয়ে টোল শিক্ষার অধোগতি রোধে বিশল্যকরণীর খোঁজ করছেন, ততদিনে কলকাতা সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮২৪) হয়ে গেছে। রামমোহন রায় লর্ড আমর্হাস্টকে লেখা চিঠিতে (১৮২৩) ইংরেজির জন্য জোরালো সওয়াল করে ফেলেছেন।

শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা ততদিনে খুবই সক্রিয়। তাদের হাতে এদেশিদের সাবেকি শিক্ষার খোলনলচে পালটে ফেলার নীল নকশা তৈরি হচ্ছে। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে মার্সম্যান, ওয়ার্ডরা, ইংল্যান্ড থেকে শ্রীরামপুরে আসেন। ১৮০০-এ আসেন উইলসন কেরী। এর আগেই অবশ্য ১৭৯৪-এ কেরী মালদার মদনাবতীতে দেশীয় বালবাচ্চাদের জন্য স্কুল খুলেছিলেন। ১৮০৪ খ্রি. যশোরে চারটে, দিনাজপুরে একটা, কাটোয়ার একটা বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর গাঁথা হয়। ১৮১২-র মধ্যেই কলকাতার বাইরেই নয় নয় করে আট-দশটা বিদ্যালয় গজিয়ে ওঠে।

শোনা যায় শ্রীরামপুরে ওয়ার্ডের দায়িত্ব ছিল মুদ্রণশালার। ১৮০০ নাগাদ শ্রীরামপুরে অক্ষরের ঢালাইখানা সহ বিরাট মুদ্রণশালার প্রতিষ্ঠা গুরুত্বের দিক থেকে এদেশে রেল চলার মতোই বিরাট ঘটনা, যেটা কয়েক হাজার বছরের পুঁথিযুগের অবসান সূচনা করে। এই প্রেস নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে শ্রীরামপুরের দিনেমারদের বেশ একচোট মন কষাকষি হয়েছিল।

এটা ভুললে চলবে না যে, এতসব কিছুর যোগফল যেটা, সেটা খুব স্বাভাবিকভাবেই দেশীয় সমাজে একটা নতুন রুচির বিকাশ। এসব কথা বহুচর্চিত, তবু মনে করে নিলে টোলবাহিত শিক্ষাচিত্রের যে দ্রুত অধোগতি তা বোঝার সুবিধা হয়। এই চিত্র ১৮৫৪-এ বাংলার রেল চলার ঢের আগের। প্রায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বাংলার দূর দূর গ্রামে অবশ্য সর্বত্র সমানভাবে এই নতুন রুচির ঢেউ এসে পৌছয়নি, পুরোনো স্মৃতিশাস্ত্রের দাপট তখনও

সেখানে অক্ষুন্ন। স্মৃতিরত্নরা তখনও কমজোরি গফুর মিঞাদের[৫] রীতিমতো শাসনে রাখে। তবুও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে গ্রাম্য পাঠশালাগুলো এরপরও টিকে থাকলেও প্রবল চাপের মুখে ছিল। টিকে যদিও ছিল ধিকিয়ে ধিকিয়ে এরপরও কমবেশি আরো একশো বছর!! জনপ্রিয় বাংলা সাহিত্যে ও সিনেমায় তার প্রতিফলন যথেষ্ট। পথের পাঁচালির প্রফুল্ল গুরুমশাই-এর পাঠশালা ভোলার কথা নয়; কিন্তু শহর কলকাতায় আর তার আশপাশের মফস্বলের অবস্থাটা খুব তাড়াতাড়ি পালটাচ্ছিল।

তাই হুতোমকে লিখতে দেখি- ''ক্রমে আমরা চার বছরে মুগ্ধবোধ পার হলেম, মাঘের দুই পাত ও রঘুর তিন পাত পড়েই আমাদের জ্যাটামোর সুত্র হলো; টিকী, ফোঁটা ও রাঙা বনাতওয়ালা টুলো ভট্টাচার্য্য দেখলেই তক্ক কত্তে যাই, ছোঁড়া গোছের ওই রকম বেয়াড়া বেশ দেখতে পেলেই তক্কে হারিয়ে টিকী কেটে নিই....।''[৬]

মনে রাখতে হবে হুতোমের নকশার কলকাতা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ায়। স্বল্পায়ু কালীপ্রসন্ন সিংহ ওরফে হুতোমের জীবৎকাল ১৮৪০ থেকে ১৮৭০.... টিকি, ফোঁটা দেখলে তর্ক করতে যাওয়ার কথা তখনও বাংলার গ্রামসমাজে বা পলাশি-যুদ্ধপূর্ব বাংলায় প্রায় অকল্পনীয় ছিল। কিন্তু শহর কলকাতা ও আশেপাশে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তথা তাদের একান্ত নিজস্ব কর্তৃত্বে থাকা শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধার আসন ততদিনে টলে গেছে।

তাই এ যে শুধু ব্রাহ্মণদের পেশাগত বিপন্নতা তা নয়, এ এক নতুন রুচি (জ্ঞানতাত্ত্বিক) দিয়ে তৈরি হতে থাকা পৃথিবীতে পা রাখার জায়গা করতে পারার বা না পারার কথাও বটে।

যা হোক বামুন পণ্ডিত সম্প্রদায়ের দূরবস্থার আরো কথা কথান্তরে যাচ্ছি না। হুতোমকে যদি নেহাতই বিশ্ববখাটে কথাসর্বস্ব ধনীর ঘরের চ্যাংড়া মনে হয়, তবে একথাগুলো একেবারেই পণ্ডিত ব্রাহ্মণ পরিবারের লোক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ১৮৮৩ নাগাদ বঙ্গদর্শনে লেখা ভট্টাচার্য বিদায় প্রণালীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে।

শাস্ত্রীমশাই টুলো ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বংশের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও উনিশ শতকের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানসিকতা বিষয়ে রাখঢাক না করেই বলেছেন, ''কিন্তু আমাদের অধ্যাপকরা একখানা টোলঘর খাড়া করিয়াই কিসে দুপয়সা পান সেই চেষ্টাতেই দিন রাত বড়ো মানুষের খোশামোদ করিয়া ছুটিয়া বেড়ান, সেটা আবার অত্যন্ত ঘৃণাকর। টোল খুলিলেন তো লেখাপড়া দক্ষিণান্ত হইল, কেবল জুয়াচুরি, খোসামোদ আরম্ভ হইল, কেবল ছেলেবেলায় একদিন লেখাপড়ায় যে বড়ো সাইন (Shine) করিয়াছিলেন সেই দাম্ভিকতা মাত্র বাকি রহিল, ভড়ং বাড়িল, কার্যে অষ্টরম্ভা'' [ভট্টাচার্য বিদায়প্রণালী, বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ, ১২৮৭]

এতকথা পাড়া এই কারণে যে, টোল সংস্কার বিষয়ে মহেশচন্দ্রের প্রস্তাবগুলোকে আমরা বদলাতে থাকা এই বৃহৎ সামাজিক চালচিত্রে বসিয়ে দেখলে একেবারে কার্যকরী বলে মনে হয় না।

মহেশচন্দ্র জানিয়েছিলেন বলে দেখি যে, আর্থিক সাহায্যই টোল শিক্ষার একমাত্র সঞ্জীবনী। কিন্তু সামাজিক প্রেক্ষাপট এতক্ষণ যা দেখাবার চেষ্টা করলাম, সেটা মাথায় রাখলে তা মনে হয় না। কারণ ততদিনে টোল নামক পুরোনো ভেঙে যাওয়া সমাজের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব শেষ হতে চলেছে যাকে আর আগের অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যেতে পারে না।

তবুও মহেশচন্দ্ররা দেওয়াল লিখন না পড়ে আশার মালা জপে চলেছিলেন। মহেশচন্দ্রের এই আশাবাদ সেই উনিশ শতকের কী হবে কী হবে না পরিস্থিতিতে যদিও ক্ষীণভাবে সমর্থন করাও যায়, আজ এই দেড়শো বছর পর কাউকে সেই কথা বলতে দেখলে বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না বই কী!

উড়িষ্যা বাংলার মোট ৭৬১টি টোল পরিদর্শন করে ৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯১ মহেশচন্দ্র যে রিপোর্ট দেন তাতে দুই প্রধান প্রস্তাব ছিল—

১. "A Provision for large salaries or stipends to the teacher of a few selected Tols."
২. "A system of small stipends to be awarded annually or for Short terms to teachers and pupils on the result of periodical examination."

১৭ই জানুয়ারি ১৮৯২ মহেশের প্রস্তাবিত রিপোর্ট-টি তৎকালীন ডি পি আই ক্রফট গর্ভনরের কাছে সুপারিশ করেন।

কিন্তু ক্রফটের সুপারিশে ছিল একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ স্বীকারোক্তি... "If by any small subsidy, such as that now proposed, the threatend decadence of the class od Pandits can be in any way arrested, if stronger intellects can be attracted to the Tols, and if the former vigour of these ancient institutions can be restored, it can hardly be contested that money will be well-spent."

এতসব পুরোনো colonial কাসুন্দির এই বিস্তারিত সাতকাহন ঘাঁটার কারণ হচ্ছে এই যে অতনুবাবুর লেখা পড়ে কি এটাই বোঝা যায় না যে ঠিক এই চিত্রটাই ছিল দেড়শো বছর আগেও এবং সে অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি এই দেড়শো বছরেও হয়নি এবং এবং হবেও না।

সুতরাং কারণটা শুধুমাত্র স্বাধীনতা পরবর্তী সরকারি উদাসীনতা নয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসনিক তরফে অকুণ্ঠ সাহায্যের চেষ্টা সত্ত্বেও টোলের শিক্ষাচিত্রের অধোগতির শুরু সেই উনিশ শতকের প্রায় গোড়ার থেকেই যা কখনোই আর আটকানো যায়নি।

কিন্তু তার কারণটা পরিষ্কার করে এতদিনে স্বীকার করা উচিত ছিল যে, শুধুমাত্র আর্থিক সংগতির অভাবে নয়, টোলের শিক্ষাসূচি তথা দর্শনের ঐতিহ্যও সামাজিকভাবে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবার শুরু সেই উনিশ শতকের colonial বাংলার গোড়ার দিনগুলোতে যেটা আর কখনোই পুনরুদ্ধার করা যায় না।

১.২: অমীমাংসিত সেই প্রশ্নটা

কিন্তু সময় থেমে থাকে না। এসব টুলো কথার সাত-সতেরো তারপর যে প্রশ্নের ঘাটে গিয়ে ঠেকেছিল সেটা আরো মোক্ষম। এতদিন মোটামুটি উনিশ শতকের প্রথমভাগ জুড়ে প্রশ্নটা ছিল মূলত পরিকাঠামো নিয়ে— যুগ যুগ ধরে চলে আসা টোলের পরিকাঠামোকে কীভাবে আরো আর্থিক সংগতির বাড়তি অক্সিজেন দেওয়া যায় নাকি অন্য কিছু সাতসতেরা এমনতর কথা। এ প্রশ্নের কোনো চটজলদি সমাধান হয়নি আমরা দেখেছি। হবার কথাও নয়! কিন্তু এ প্রশ্নের সমাধান না হলেও এরই হাত ধরে একটা নতুন প্রশ্ন তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু এ প্রশ্নটা শুধুমাত্র পরিকাঠামো নিয়ে নয়, বিষয়বস্তুরও বটে! একটু আগেই বলেছি ক্রফটের সুপারিশে একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ ছিল যেটা টোল শিক্ষিত পণ্ডিতরা একেবারেই গুরুত্ব দিয়ে ভেবেছিলেন বলে মনে হয় না। পর্যবেক্ষণটা টোলপাঠ্য বিষয়বস্তুর 'নবীকরণ' সংক্রান্ত যেটা সত্যিই "stronger" (পড়া যাক নতুন রুচির) intellect-দের কাছে আকর্ষণীয় লাগবে, 'নতুন' রুচির সঙ্গে মানানসই হবে।

কিন্তু প্রশ্নটা লিখতে বা প্রস্তাব হিসাবে পেশ করা সহজ হলেও এর এমনকী চলনসই উত্তরও বেশ কঠিন, কারণ তার জন্য বুঝতে হবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলিত জ্ঞান পরম্পরার (knowledge dynamics) সে সময়ে দরকারি অংশটুকু, যাকে আজকের ভাষায় interdisciplinary discourse বলা যায় সেটা বলতে ঠিক কী বোঝায়-

প্রাচ্যের কতটা আর পাশ্চাত্যের কতটা নিয়ে তৈরি হওয়া উচিত ছিল (বা এখনও আছে!) এক টোলবাহিত হিন্দু পাঠ্য 'নতুন' পাঠক্রম!!

এ গোলমেলে প্রশ্ন দীর্ঘ মুসলিম শাসনকালে ওঠেনি যে (আরব দেশের) মাদ্রাসাবাহিত জ্ঞান আর এদেশের টোলবাহিত জ্ঞানের এক মিশ্র পাঠক্রম (interdisciplinary syllabus) কী হতে পারে? মক্তব, মাদ্রাসা আর পাঠশালা, টোল কেউ কারো ধার না ধেরেও এ বাংলায় প্রায় ছয়শো বছর ধরে সমান্তরাল ভাবে চলেছে। একপক্ষ আরেকপক্ষের পাঠক্রমের academic content নিয়ে কদাচিৎ মাথা ঘামিয়েছে। আরবি, ফারসি জানা অনেক হিন্দু (মূলত কায়স্থ হিন্দু) থাকলেও আল্লা ও ঈশ্বর নিজের নিজের স্বস্থানে প্রথামতো বিরাজ করেছেন।

কিন্তু আমরা দেখেছি যে, এদেশের সামাজিক পরিসরে টোলের পাঠক্রমের সম্ভাব্য প্রতিস্পর্ধী হিসাবে পশ্চিমি জ্ঞানবিজ্ঞান আসার পর এহেন নতুন এক প্রশ্ন এল, ইংরেজি শিক্ষার কতটা আর মূলত সংস্কৃত ভাষা বাহিত শিক্ষার কতটার মধ্যে তালমিল আছে?

আগেও বলছি, আবারও বলি। বৃত্তিগত পেশার ভিত্তিতে বিভক্ত যুগ যুগ ধরে চলে আসা প্রাক্ ঔপনিবেশিক বাংলার (তথা ভারতের) গ্রামীণ পরিকাঠামোয় এই প্রশ্ন (বা প্রশ্নটা যে চাহিদাটা নিয়ে) এতকাল সম্পূর্ণ অবান্তর ছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক বাংলার একেবারে গোড়া থেকেই ভাঙতে থাকা (de-structured) বাংলার সমাজে পরিবর্তনের বেনোজলে প্রশ্নটা তৈরি না হয়ে কোনো উপায় ছিল না— প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কতটা তালমিল?

তবে আর একটা কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করে নেওয়া দরকার। টোলবাহিত উচ্চশিক্ষার সামাজিক চাহিদার প্রশ্নটাই মোটের ওপরে এদেশে যুগ যুগ ধরে অবান্তর ছিল। সামাজিক বা আরো নির্দিষ্ট করে বললে ব্যবহারিক বিদ্যার পাট চুকে যেত পাঠশালায়।

একথা সর্বজনগ্রাহ্য ছিল যে, টোলের শিক্ষা কোনোভাবেই লোকশিক্ষা নয়! শাস্ত্রীমশাইকেই আবার উদ্ধৃত করি, ''ভট্টাচার্যদিগের শিক্ষা লোকশিক্ষা নহে, উহা দ্বারা সাধারণ লোক লিখতে পড়তে ও অঙ্ক কষিতে মাত্র শিখিবে তাহা নহে, উহাতে বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, অলংকার ভাষা ইত্যাদি উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা দেওয়া হয়, অতএব উহা উচ্চশিক্ষা'' [ভট্টাচার্য বিদায় প্রণালী, বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ, ১২৮৭]

এ ক-টা লাইনের মানে এভাবেও করা যায় যে, টোলের শিক্ষা বিষয়গতভাবে কখনো ব্যবহারিক বা সামাজিক চাহিদার প্রয়োজনের ধার ধারেনি। অবশ্য এটা একেবারেই আশ্চর্য নয়, কারণ, সেকালের (প্রাক ঔপনিবেশিক) সমাজব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সামাজিক অবস্থান এবং তার পাঠ্য বিষয়ের সাধারণ রূপরেখা যেভাবে স্থিরনির্দিষ্ট ছিল তার থেকে অন্যরকম সামাজিক চাহিদা তৈরির কোনো অবকাশই ছিল না। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, শাস্ত্রী মশাইয়ের লেখাতেও দেখছি যে, অঙ্ক উচ্চশিক্ষার মধ্যে পড়ত না! আশ্চর্য নয় যে অঙ্ককষাকে নীচ গ্রহবিপ্রের বা নিম্নশ্রেণির পতিত বামুদের কাজ বলে ভাবা হত। এই চলে আসছিল যুগ যুগ ধরে। [১]

কিন্তু উচ্চশিক্ষার এই বিষয়বস্তু একেবারে গুলিয়ে গেল কোম্পানির রাজত্বের শুরুতেই, যার পরিণতি শেষমেষ ওই তালমিলের প্রশ্ন। এই প্রশ্নটার আধুনিক ভাষ্যটা বলি একটু

অন্যভাবে, খুব সোজা কথায়, যে-কোনো সংস্কৃত ভিত্তিক পাঠক্রমে, সেটা টোলেই হোক বা কোনো কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে, আজ (২০০৯-এ) একজন কী পড়বে এবং কেন পড়বে যা 'আধুনিক' প্রয়োজন বলে অতিগোদাভাবেও আমরা যা বুঝি তার সঙ্গে কোনও না কোনোভাবে সংগতিপূর্ণ?

অস্বীকারের কোনো জায়গাই নেই যে প্রশ্নটা আমরা আজ অবধি ঠিকঠাক মোকাবিলা করে উঠতে তো পারিইনি, উলটে ল্যাজেগোবরে হয়েছি ব্যক্তিগতভাবে ও প্রাতিষ্ঠানিক-ভাবেও।

সূত্র

১. আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯-৩০ জুন, ২০১৮
২. পৃষ্ঠা ৭৫, হুতোম প্যাঁচার নকশা, সম্পাদনা অরুণ নাগ, সুবর্ণরেখা, ১৪০৩
৩. পৃষ্ঠা ৭৮, ওই
৪. পৃষ্ঠা ৯৩, ওই
৫. মহেশ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৬. পৃষ্ঠা ১৩৭, হুতোম প্যাঁচার নকশা, সম্পাদনা অরুণ নাগ, সুবর্ণরেখা, ১৪০৩

আমার কলকাতা

অশোককুমার মুখোপাধ্যায়

তিন

হেয়ার স্কুলে সকালের ক্লাস আরম্ভের আগে গান-প্রেয়ার! আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর...। রেখাদি হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান ধরতেন, কখনো বেলাদি, সবাই গলা মেলাত। মানুষটির মতোই রেখাদির গলা নরম, সুরেলা। সেই তুলনায় ল্যামব্রেটা স্কুটার চেপে স্কুলে আসা নাতিদীর্ঘ বেলাদি, বেলা দুগার, মেজাজে একেবারে ঝাঁঝালো দেশাত্মবোধক। ১৯৬২-৬৩ সালে শিল্পী বরের পেছনের আসনে বসে প্রতিদিন কেউ স্কুলে আসছে, এ তেমন সাদামাটা দৃশ্য নয়! দেখার জন্য আমাদের অনেকেই নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকত।

গানের পর সারি দিয়ে ক্লাসে যাওয়া। সাড়ে দশটায় ছুটির ঘণ্টা বাজলেই হইহই করে বেরিয়ে এসে বাড়ি ফেরা। যবে থেকে নিজের মতো পথচলা, ফিরতি রাস্তার সামান্য অদল-বদল হয়। মির্জাপুর স্ট্রিট (বাবা বলতেন, এই রাস্তার নাম হয়েছে সূর্য সেন স্ট্রিট। অতএব, নতুন নামে ডাকা উচিত।)-শ্রীগোপাল মল্লিক লেন-ব্রজনাথ দত্ত লেন-সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেন-আমহার্স্ট স্ট্রিট-স্কট লেন। কলেজ স্ট্রিটে ট্রাম চলত, বাসও। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণিতে পড়া ছেলেটির রাস্তা পার হতে অসুবিধে হয়নি তেমন। স্কুল ফটকের সামনেই জেব্রা ক্রসিং। দুদিক ভালো করে দেখে নিয়ে রাস্তা পার হও, গোলদিঘির রেলিং-এ হাত বুলোতে-বুলোতে, দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ঘেরাটোপের মধ্যে থাকা পাম্বপাদপ গাছটিকে এক ঝলক দেখে নিয়ে সূর্য সেন স্ট্রিটে পড়েই গলিপথ ধরে নাও। পরস্পরের সই-পাতানো গলি সব! ঠিক তোমায় পায়ে-পায়ে আমহার্স্ট স্ট্রিটে পৌঁছে দেবে। ব্যস, দুদিক দেখে ওই বড়ো রাস্তা পেরিয়ে স্কট লেনে ঢুকে আটচল্লিশ নম্বরের এলা রঙের বাড়ির সবুজ দরজায় কড়া নাড়া। খুবই সহজ তখন হাঁটাচলা!

শ্রীগোপাল মল্লিকের গলির একটি বাড়ি থেকে পাওয়া যেত ডাল সাঁতলানোর গন্ধ— সে আশ্চর্য গন্ধ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে পথ চলত যতক্ষণ না এই গলি অন্য গলিতে ঢুকিয়ে দেবে তোমায়! যেদিন পাওয়া যেত না, ধরে নিতাম যিনি রান্না করেন তাঁর ডেঙ্গু হয়েছে! কথায় কথায় ডেঙ্গু হয় তখন। আমাদের পাশের বাড়ির মেয়ে শিবানী, যে খোনা গলায় কথা বলত, মারাই গেল ডেঙ্গুজ্বরে। তারপরেই আমার ভাইয়ের ঘন জ্বর এবং তা কালীপুজোর সময়ে। নিশ্চিত। কারণ, ওর মুখের হাসি দেখবার জন্য সদর দরজা খুলে তুবড়ি জ্বালানো হল ঘটা করে। পরে জানা গেল, না ডেঙ্গু নয়, বাতজ্বর— রিউম্যাটিক ফিভার!

গলিপথের আর এক চেনা গন্ধ নোনাধরা দেওয়ালের। দেওয়ালের গায়ে অবধারিত, অনিবার্য উই ভূগোলের ম্যাপ এঁকে চলেছে! আমাদের চাঁপাতলা, নেবুতলার উই বিশ্ববিখ্যাত। সত্যি! এই যে সারকুলার রোডের (এখন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড) জোড়া গির্জা, সেন্ট জেমস চার্চ, তার আগের ঠিকানাটা কোথায়? নেবুতলা লেন। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের সেন্ট টমাস চার্চের আদলেই তৈরি। বিশপ রেজিন্যাল্ড হেবার ঈশ্বরের সেবায় একে উৎসর্গ করলেন ১২ নভেম্বর ১৮২৯। কয়েক বছরের মধ্যেই দেখা গেল উইপোকার আক্রমণ। গাঁথনিতে উই, দেওয়ালে উই, কাঠামোতে উই! ভেতরে ভেতরে ফোঁপরা হয়ে গেছে চার্চ-বাড়ি। তিরিশ বছর পরে একবার সারাবার উদ্যোগ নিয়েছিল সাহেবরা। কাজ চলবার সময়ে, ২৩ অগস্ট ১৮৫৯ ভোরবেলায় বাড়ির ছাদ ভেঙে পড়ল। একটা গোটা চার্চকে মাটিতে মিশিয়ে দিল উইপোকা বাহিনী! সাহেবরা অন্যত্র পালিয়ে বাঁচল।

এইজন্যই নিয়মিত ধুলো ঝাড়তে হত চাঁপাতলা, নেবুতলার পড়ুয়াদের। সে তুমি উকিল-অধ্যাপক-গবেষক-ডাক্তার যাই হও, উই ছাড়বে না। সাতকাণ্ড রামায়ণকে অন্তত তিনবার উইয়ের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়েছি আমি, সেই বালকবেলায়! কিন্তু কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের কয়েকটি পাতা একবার দাগী হয়ে গিয়েছিল। মেঘনাদবধ কাব্যের দিকে তেমন নজর দিতে পারিনি মাস ছয়। দেখলাম মলাট অক্ষত। কী আনন্দ! কিন্তু যেই না আদর করে পাতা সরানো, সব ধুলো! যারা একটা গোটা চার্চ

উপড়ে দিচ্ছে তাদের কাছে রামায়ণ-মহাভারত-মেঘনাদবধ কাব্য, ভারতের সংবিধান সব নস্যি! প্রতি মাসে ইলেকট্রিক মিটারের নম্বর টুকতে আসতেন যারা, তাঁদের জানাই ছিল মিটার বক্সের সামনে উইয়ের সারি দেখা যাবে, না দেখা গেলে টর্চধারী কোনো রসিক ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসা করতেন— কী ঝাড়পোঁছ হয়েছে নাকি!

কানাই ধর লেন দিয়ে ফেরা হত কখনো সখনো। ওই গলিতে হারমোনিয়াম-তবলা বানাবার দোকান ছিল। চোখের সামনে দেখতাম বেসুরো আওয়াজ কীভাবে সুরের বশ মানছে। অবাধ্য প্যাঁ-পোঁ-ভ্যাঁ-পোঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ বদলে যাচ্ছে শান্ত-শিষ্ট 'সা-রে-গা-মা'য়। এই রে...ঠিক মিলেও মিলল না সুর.. কারণ কানে তো তেমন সুর, যা সন্ধেবেলায় চারপাশের বাড়ি থেকে ভেসে আসে, তার সঙ্গে ঠিক মিলছে না...এই...এইবার মিলেছে। যতক্ষণ না সুরে বসছে সব কিছু, নড়তে মন চাইত না— দম আটকে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। মিলে গেলে 'ঠিক-ঠিক' ভঙ্গিতে মাথা নড়ত আমাদের। যিনি সুরে বাঁধছিলেন যন্ত্রটিকে, হাসতেন—'এখনও নিখুঁত হয়নি, আরো সুর আসবে, আরো সূক্ষ্ম হবে...যত বাজাবে তত সুর খুলবে...ছমাস পরে টিউনিং করালে আরও ভালো হবে।' কলকাতার গলিতেই সুর চিনতে শেখা প্রথম। খুব ইচ্ছে করত হারমোনিয়াম কেনবার। কিন্তু মধ্যবিত্ত বাড়ির অনেক ইচ্ছের মতোই এও বিশ্বকর্মার পুজোর কাটা ঘুড়ি—নীরবে হাওয়ায় ভেসে গেছে। কানাই ধর লেনের আর এক আশ্চর্য—ছাতার বাঁট তৈরির কারখানা। তখন তো ছাতার বাঁট মানে কোনো জটিল প্লাস্টিক বা দো-আঁশলা ধাতুর কারবার নয়, এ হল প্রাকৃতিক বেতের উপাচার। তার আঁশ ছাড়িয়ে ঘষে ঘষে মোলায়েম করা থেকে চাকচিক্য আনবার ক্রিয়া-কর্ম দেখা মানে চৌষট্টি পাতার রুদ্ধশ্বাস স্বপনকুমার গোয়েন্দা-কাহিনি পড়া! কালো কাপড়ের ছাতার জন্মবৃত্তান্ত আর শুঁয়োপোকার প্রজাপতি হয়ে ওঠায় খুব কিছু তফাত নেই।

কানাই ধর লেনে নাকি যুগান্তর পত্রিকার দপ্তর ছিল, বাবা বলেছিলেন। এ সেই ১৯০৬ সালের যুগান্তর, যাতে ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, দেবব্রত বসু, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়— এঁরা সব। যাতে নিজেদের ভয় ভেঙে ইংরেজদের লাঠিপেটার দাওয়াই দেবার কথা লেখাতে এক বছরের জন্য জেলে থাকবার সাজা হয়ে গেল ভূপেন্দ্রনাথের। এমনি থাকা নয়, তেলের ঘানিও টানতে হবে স্বামী বিবেকানন্দের এই ছোটো ভাইটিকে! জ্ঞানগম্যি হবার পর বাড়িটা খুঁজে বের করবার চেষ্টা করেছিলাম। ঠিকানা ধরে বাড়িতে গিয়েওছিলাম, কিন্তু যুগান্তর পত্রিকার কোনো চিহ্ন নেই! আমাদের স্কট লেনেও একটা দাঁত বের করা বাড়ি ছিল, সম্ভবত দশ নম্বর, অরবিন্দ ঘোষ নাকি লুকিয়ে ছিলেন কিছুদিন, অনেকদিন পরে দেখলাম, তাতে একটা ফলক লেগেছে।

সিদ্ধেশ্বরচন্দ্র লেন এমনিতে সাদামাটা। এলাকার অন্য বাড়ির মতোই এই গলির বাড়িগুলোও গায়ে-গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে। শুধু দুটি উঁচু বাড়ির মাঝে একটুখানি ফাঁক— বাড়িয়েও যদি বলি আড়াই ফুট। বাড়িদুটিকে পর্বত ভাবতে পারলে, এই ফাঁক নিশ্চয়ই গিরিখাত। এ-পারে চোখ রাখলে ও-পারের লোক চলাচল দেখা যায়। সেই তিনশো মিটার লম্বা গিরিখাত দিয়ে অচঞ্চল হাঁটলে তিন মিনিটে ও-পারের প্রেমচাঁদ বড়ালের গলিতে পড়া যেত, যেখানে ওই রাস্তা আমহার্স্ট স্ট্রিটের কোলে ওঠবার তোড়জোড় করছে। আচমকা খুঁজে পাওয়া এই গিরিসংকট সত্তর সালের সাহসী বন্ধুদের পুলিশের সঙ্গে লুকোচুরি খেলায় খুব কাজে লেগেছিল।

শনি-রবিবারের বিকেলটার জন্য মুখিয়ে থাকতাম দুভাই (এক পিসি 'আদর করে' আমাদের ১৯৫৯ সালের হিন্দি ছবি নামে 'দো গুন্ডে' বলে ডাকত।) কারণ, বাবার সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া হবে। বউবাজার স্ট্রিট আর আমহার্স্ট স্ট্রিট যেখানে কাটাকুটি খেলছে, ঠিক সেইখানেই এম বি সরকারের সোনার দোকান, যা এখন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, তার সদরের ঠিক উলটো ফুটপাতে দাঁড়ালে দেখা যেত ডানদিকে শিয়ালদা স্টেশন থেকে (ওইখানেই ট্রাম ডিপো) ট্রাম লাইন গড়াতেগড়াতে কোলে বাজারের পাড় ঘেঁষে এসে বউবাজার স্ট্রিট ধরে পশ্চিমের গঙ্গা লক্ষ করে ছুটেছে। চোদ্দ নম্বর ট্রাম আসত ঠিকই। দাঁড়াতে-না-দাঁড়াতেই, প্রথম কামরায় উঠেই ঝপ করে সবুজ আসনে বসে পড়া। শনি-রবিবার খালিই পাওয়া যায়। সেই হাইকোর্টের গুমটিতে পৌঁছে নেমে পড়তাম আমরা। ফিরতি ট্রামের সময়গুলি জেনে নিতেন বাবা। তারপর হাঁটতে হাঁটতে সোজা ইডেন গার্ডেনস্। বাগানের দক্ষিণের ফটক দিয়ে গড়ের মাঠ। দৌড়ের নেশা চেপে যেত। দৌড়োতে দৌড়োতে মনে হত এ যেন গল্পে শোনা তেপান্তরের মাঠ! যতই দৌড়োই কোনো দিন ফুরোবে না।

সন্ধের রং ধরলেই, পুবপ্রান্তের দোকানগুলিতে আলো জ্বলে উঠত। আলোর কারিকুরিতে দেখা যেত কেটলি থেকে কাপে চা পড়ছে। কাপ ভর্তি হতেই আলো নিবে আবার জ্বলে উঠল— লিপটন টি। এনি টাইম ইজ লিপটনস্ টি টাইম।

হাইকোর্টের ট্রাম-গুমটিতে ফিরে তখনও দেখা যেত সবুজের ছোঁয়া লাগা সাদা ট্রাম একলা, চুপচাপ ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে। কোনো যাত্রী নেই। আমরা বসলে কিছুক্ষণের মধ্যেই কন্ডাক্টর ছাড়বার ঘন্টি বাজাতেন।

এমনই এক রবিবারের বিকেলে আশুকাকু আমাদের রাবড়ি খাইয়েছিল। সময়টা যে বিকেল ছিল, বেশ মনে আছে। কারণ, সকালবেলায় জেঠুর কাছে বকুনি খেয়েছিলাম।

এক ডজন কচুরি কিনতে পাঠিয়েছিল জেঠু। রাস্তা পেরোলেই জগৎলক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার। কচুরি কিনলাম। না চাইতেই দুটো গুঁজিয়া ফাউ পাওয়া গেল। এই ফাউ পাবার ব্যাপারটা বড়ো অদ্ভুত। বিশেষত, টক দইয়ের ব্যাপারে। যদি মিষ্টি বা নোনতা কেনার পর বলা হত— একটু দই ফাউ দাও না কাকু, দিয়ে দেবে। কিন্তু যদি সত্যি কথা বলা যায়, একটু পাতবার মতো দই দাও— দেবে না। সন্ধেবেলায় ছুঁচ কিনতে গেলে দেবে না। কী যে সব দস্তুর!

সকালবেলায় ফাউ দইয়ের দরকার নেই, পাওয়া গেল গুঁজিয়া। মিষ্টিদুটো মুখে পুরে, শালকাতার চ্যাঙাড়ি ভরা গরম কচুরি হাতে দুদিক দেখে রাস্তা পেরিয়ে স্কট লেনে ঢুকে পড়েছি। আর একটা বাড়ি পার হলেই আমাদের বাড়ির লোহার গেট। হঠাৎ হইহই করে উঠল রাস্তার লোক। মাথায় কে যেন ঝাপটা মারল। ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থা! দেখি একটা চিল ছোঁ মেরে চ্যাঙাড়ির ঢাকনা আর কয়েকটা কচুরি নিয়ে উধাও! ঘরে ফিরতেই জেঠুর বকুনি— 'একদম হাঁদারাম, চিলটাকে তাড়াতে পারলি না!' বাবা জেঠুর পক্ষে। মা-ও চুপচাপ। খুব রাগ হল। আর একবার হাঁদারাম বলতেই আশুকাকু খেপে গেল— 'আচ্ছা বড়দা, ও কী করে বুঝবে চিল আসছে? আকাশের দিকে তাকিয়ে হাঁটবে নাকি? ঠোঙাটা হাতছাড়া না করে যে ঘর অবধি এনেছে এই-ই অনেক...যে ক'টা কম পড়বে আমি নিয়ে আসছি...' দড়াম করে দরজা বন্ধ করে কাকু বেরিয়ে গেল।

মনটা খারাপ হয়ে রইল অনেকক্ষণ। আসলে গুঁজিয়া মুখে দিলেই আমার সব বোধ জিভে জড়ো হয়। এই জন্যই অন্যমনস্ক ছিলাম। তবেই না চিলটা—

বিকেলবেলায় আশুকাকু নিয়ে গেল সেই জগৎলক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে। ভেতরে বসলাম। শ্বেত পাথরের টেবিল, কাঠের চেয়ার। তখন সব খাবারের দোকানই বোধহয় এমনই। দোকানদারকে দেখতে মালপোয়ার মতন। তাকে কাকু আলাদা করে কীসব বলল। একটু পরেই প্লেটে করে লালচে-সাদা আধা-তরল পদার্থ চলে এল টেবিলে।

'এ আবার কী?'

'খেয়েই দ্যাখ না...'

মুখে দিয়েই মনে হল কোথায় লাগে গুঁজিয়া-জিলিপি-অমিত্যি। এ তো দারুণ খেতে, আরামে চোখ বুজে আসে।

'কাকু এটা কী?'

'রাবড়ি...ওই দ্যাখ রাবড়ি তৈরি হচ্ছে।'

দোকানের কোনায় মাটির উনুন। দুধ ভর্তি বিশাল কড়া চাপানো উনুনে। কড়ার তলায় আঁচ। ওপরে হাতপাখা নেড়ে চলেছে একটি ছেলে।

খাওয়ার পরে কাকু দোকানিকে বলল, 'এ আমার ভাইপো, যখনই এসে রাবড়ি চাইবে, দেবেন।

তারপর অনেকবার জগৎলক্ষ্মীতে গেছি। বলেছি 'আশুকাকুর ভাইপো, রাবড়ি খাব।' দোকানি সঙ্গে-সঙ্গে বলতেন, 'হ্যাঁ বাবা, বসো।' কথার পিঠেই হাঁক পাড়তেন, 'এই...আশুদার ভাইপোকে রাবড়ি...' যার বোঝবার সে ঠিকই বুঝে যেত ফরমায়েশটা। টেবিলে এসে যেত রাবড়ি আর গেলাস-ভর্তি জল! আশুকাকু তখন আমার নায়ক। কাকুর নাম করলেই এইরকম আড়েবহরে বিশাল এক দোকানদার বসিয়ে রাবড়ি খাওয়ায়! এরকম কাকু ক'জনের আছে?

পরে, লায়েক হবার পর বুঝেছিলাম, কাকুর নামে ওই দোকানে মাস-কাবারি খাতা ছিল। মাসের শেষে কাকু হিসেব মেটাত।

চার

পুরোনো কলকাতার অনেক পাড়ার মতোই স্কট লেনেও খাটাল ছিল। তবে এ-পাড়ার খাটাল নিয়ে লিখতে বসলে একটা মাঝারি গোছের বই হয়ে যায়। খাটাল মানে তা শুধু গরু আর দুধ নয়, দুধ আর দুধে জল-মেশানো নয়, বিচালি কী জাবরকাটার গল্প নয়, অথবা শুধু গোময়-ঘুঁটে কী গোমূত্রের কারবার নয়— এ গোয়ালাদের গল্পও বটে।

বিহার থেকে জমি হারিয়ে ধান্দার টানে কলকাতার চাঁপাচলায় আস্তানা গেড়েছিলেন গোটা দশেক গোয়ালা। সত্যি বলতে হলে, নিজেদের চওড়া গাড়ি রাখবার জায়গায় খাটাল চালাবার উদ্দেশ্যে এদেরকে জড়ো করেছিলেন পাড়ার পয়সাওলা সেন বংশের কেউ। খাটালের মধ্যেই ওদের শোওয়াবসা। তবে কয়েকজন খাটিয়া পেতে রাস্তায়। হরিণঘাটার দুধ সত্ত্বেও, চাঁপাতলার কিছু খুঁতখুঁতে পরিবার (যার মধ্যেও আমরাও) এ-খাটালের দুধ নিত। আমাদের বাড়িতে এই দুধ ঢোকবার বড়ো কারণ যদি হয় এক মায়ের তার দুই পিলেপটকা ছেলেকে দুধে-ভাতে রাখবার ইচ্ছে, মেজো-ছোটো দুটি কারণই হল, খাটালটি এক-ডাকের নাগালে—আমাদের বাড়িতে কেউ মুখে রুমালচাপা না-দিয়ে হাঁচলে খাটাল থেকে শোনা যায়। আমরাও ওদের হাম্বা শুনতে পাই। ওদের আর আমাদের মাঝে শুধু একটি চাতাল-ওলা লাল বাড়ির ফাঁক।

মহিলা-ছুট এই বলিষ্ঠ গোয়ালা বাহিনীর নেতা রঘুনন্দন। আমাদের বাড়িতে প্রতি বিকেলে যার আসা-যাওয়া। বাড়ি বাড়ি দুধ বিক্রি করা ছাড়া কিছু বিনি পয়সার কাজ থাকত। গোয়ালাদের— পাড়ায় দুজনের গাড়ি চালু না হলে (মাত্র দু-জন গাড়িওলাই ছিলেন, একজন সেন বংশের), সওয়ারি বোঝাই বাহনটিকে ধাক্কা মারা। নির্জন দুপুরে কোনো ঘোড়ার

নাল পালটাবার সময়, চতুষ্পদটি যাতে কোনো বেয়াদবি না করে, দেখা। ভরদুপুরে সবজিবোঝাই ঠেলাগাড়ি যেত বৈঠকখানা বাজার উদ্দেশে। যে সার্কাসটি প্রায়ই দেখা যেত— সবজিবস্তার নড়াচড়াতে ভারসাম্যের বদল, ফলে ঠেলাগাড়ির সামনের দিকটি অকস্মাৎ আকাশের দিকে যেতে চাইছে। লুঙ্গি-পরা চালক ভাববার সময় না পাওয়াতে, সামনের হাতল আর ঠেলার শরীরের মাঝে যে চৌখুপি, তার মধ্যে বেদম ভয় পাওয়া মুখে শূন্যে ঝুলছে। পেছনের দুজন (কখনো একজন) ঠেলনদার অবাক। এর পরে হয়তো সংবিৎ ফিরলে তারা দড়ি টানাটানি করে ওজন বিতরণের অঙ্কটি ঠিক করবার চেষ্টা করবে। আপাতত, তাদের মাথা ফাঁকা। এই সময়েই রঘুনন্দন বাহিনী হাত বাড়িয়ে দিত।

আরো একটি কাজে ডাকা হত খাটালবাসীদের— চোর ঠ্যাঙানো। অবশ্য চোর-গুন্ডা শায়েস্তা করার ব্যাপারে আমার পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি ছাতির (পঞ্চান্ন নয় কিন্তু) বাবাও পাড়ার সেজদা। আমাদের বাড়িতে যে দুই চোর গুন্ডা এসেছিল, তাদেরকেও হুংকার সহযোগে খিল খুলে পিটিয়েছিলেন তিনিই। রাত তখন দুটো। সব কিছু হয়ে যাবার পর দোতলা-তিনতলা থেকে নেমে এলেন দুই বাসিন্দা।

'কী হয়েছে দেবুবাবু?'

'দেখছেন না হাতে কী, এই দিয়ে গরাদ বেঁকিয়ে ঢোকবার তাল করছিল, এই দেখুন গরাদ ফাঁকা...', মাটিতে পড়ে থাকা একটি লোহার রড দেখিয়ে বাবা বোঝাতে তৎপর।

একজন বললেন, 'হ্যাঁ, আমিও তো আওয়াজ পাচ্ছিলাম...'

'ও পাচ্ছিলেন! তা হলে কী করছিলেন এতক্ষণ...'

'আমি ওপর থেকে টুকটুক করে কাঁইবিচি ফেলছিলাম ওদের মাথায়, যদি ঘাবড়ে গিয়ে পালায়—'

'তেঁতুলের বিচি ফেলে ভয় দেখাচ্ছিলেন!... এই চোর গুন্ডা দুটোকে...', যে-কোনো সুস্থ লোকের মতো বাবাও হইহই করে হেসে উঠলেন। দোতলার বাসিন্দা বেশ ভদ্রলোক। বাঘা হস্টেল সুপারিনটেন্ডেন্টের গলায় হাঁক পেড়ে রঘুনন্দনকে ঘুম থেকে ডেকে আনলেন। চোরকে থানায় নিয়ে যেতে হবে যে, ভদ্রলোকেরা তো আর চোরকে স্পর্শ করে না! গরু বাঁধার দড়ি দিয়ে বাঁধা হল দুই অপরাধী। রঘুনন্দনই দড়ি টানতে টানতে নিয়ে চলল থানায়। ওপরের বাসিন্দা দুজন গেলেন ওর সঙ্গে। বাবা যাননি, কারণ ওঁর পেনাল কোড অনুযায়ী শাস্তি তো দেওয়া হয়েই গেছে, আবার কেন?

রঘুনন্দন বা তার কোনো ভাইয়াকে মাঝরাতে ঘুম ভাঙানো বেশ শক্ত। ওরা সারাদিন খাটছে কিন্তু মাঝরাতে প্রায় অচেতন অবস্থা, সহজে ঘুম ভাঙবে না। এই নিয়েই তর্ক হয়েছিল দু-দলের। যাদের সদ্যই গোঁফদাড়ি গজিয়েছে। তর্ক থেকে আরো তর্ক, তারপর বাজি। যারা বলেছিল ঘুম ভাঙবে না, সেই ছজন কাঁধ পালটাপালটি করতে-করতে রঘুনন্দনের দেশোয়ালি ভাই লছমনকে (যাদের জিভ মনে-প্রাণে বাঙালি, তারা বলত লক্ষ্মণ) খাটিয়া সমেত রেখে এল গোলদিঘির পাড়ে। রাস্তায় কেউ হরিধ্বনি করেছিল কি না জানা নেই। করে থাকলে নিশ্চিত ভুল করে করেনি। যথারীতি লছমনের ঘুম ভাঙেনি, কিন্তু সকালে ঘুম ভেঙে পাশেই মধুবাবুকা তালাও দেখে (মধ্য-কলকাতার বয়স্করা মনে করবার চেষ্টা করুন, ষাট-ছেষট্টির অনেক চামড়া ভাঁজ খাওয়া রিকশাওলা কলেজ-স্কোয়ারকে মধুবাবুকা তালাও আর ডাফরিন হাসপাতালকে জেনানা হসপিটাল বলতেন) সে বিপুল ভয় পেয়ে গিয়েছিল। যে তিনজন বাজিতে হেরে গেল তারা গোলদিঘি যাত্রীদের ঢাকা সিদ্ধেশ্বরী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে নিয়ে গিয়ে ঢাকাই পরোটা খাইয়েছিল— চারটে ঢাকাই ন'জনে ভাগ করে খাওয়া!

গোয়ালাদের সাদা-কালো চরিত্রের পাশাপাশি পাড়ার আধ ডজন রঙিন চরিত্রও ছিল। যাদের একজন বিনয় ভৌমিক, আমরা দুভাই বিনয়কাকু বলতাম। বিনয়কাকু বাবার বন্ধু, আশুকাকুরও। বাবা আর কাকুর মাঝামাঝি ওর বয়েস। ফলে, বাবাকে বলত সেজদা, কাকুকে আশু। কাকুই দেখিয়েছিল, 'দ্যাখ, দ্যাখ হাঁটার সময়ে বিনয়দাকে পাশ থেকে দেখলে ঠিক জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো লাগে। হা-হা...' আজও অক্ষর পড়তে বা লিখতে, কখনো, বিনয়কাকুকে মনে পড়ে।

বিনয়কাকু ঘোর কমিউনিস্ট। পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি। চামড়ার রং হলুদ ঘেঁষা। চীন-পন্থী ছিল বলেই বোধহয় মুখের আদলেও চিনে-চিনে ভাব! বাষট্টি সালে ভারত-চিন যুদ্ধের সময়ে এক বছর জেলে কাটিয়েছে— জোতি বসু, উৎপল দত্তের সঙ্গে ইংরেজিতে এম এ। আইন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণি। হিন্দিতেও কোবিদ না কী যেন। জার্মান ফ্রেঞ্চ চাইনিজ তিনটে ভাষাতেই পণ্ডিত। আবার লাইব্রেরি সায়েন্সেও ডিপ্লোমা করেছিল। তবু ঠিক কী যে করত বিনয়কাকু অনেকদিন অবধি বুঝিনি। লাল পতাকার মিছিল বেরুলে দেখতাম বিনয়কাকু স্লোগান দিচ্ছে, অন্যরা সংগত করছে।

পুজোর প্যান্ডেলে নাটক হলে বিনয়কাকু পরিচালক থেকে শিল্প নির্দেশক থেকে অধিকারী সব কিছু। জানালায় উঁকি মেরে মাঝে মধ্যে দুয়েকটি ইংরেজি শব্দও শিখিয়ে দিয়ে যায়। শুনশান গরমের দুপুরে বাংলা থেকে ইংরেজি ট্রানস্লেশন করতে কানের গোড়া থেকে শিরদাঁড়া সর্বত্র ঘাম গড়াচ্ছে, কী করা যায়? ঠিকঠাক না হলে সন্ধেবেলায় খড়মপেটা। ঠাকুর আমাদের কথা শুনতেন। বিনয়কাকু রাস্তায়, জানালার সামনে। হাত নেড়ে ডাকতেই জানালার গরাদে মুখ রেখে বাংলাটা একবার দেখে নিত, তারপর আমার অনুবাদ। যে-যে জায়গা দুর্বল এবং ফাঁক,

সহজ ইংরেজি শব্দ বলে বুঝিয়ে দিত। কথার সঙ্গে ভেসে আসত জর্দা পানের গন্ধ। চুপচাপ দেখিয়ে আবার রাস্তার মোড়ে মিলিয়ে যেত।

বাবার অবশ্য সন্দেহ হত ঠিকই।

'নিজে করেছিস?'

মাথাটা যদিও হ্যাঁ বলার মতোই নাড়াতাম। কিন্তু ততটা জোর থাকত না নিশ্চয়ই। অতএব দণ্ডমুণ্ডের কর্তার সন্দেহ ঘনীভূত।

'কে? বিনয় এসেছিল?

এরপর তো হ্যাঁ বলা ছাড়া উপায় নেই। বিনয়কাকুর নাম শুনলে বাবা নরম। গণনাট্য সংঘের আমলে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে পাওয়া লাল তারা খোদাই করা ব্যাজ, যা আমাদের বাড়িতে বহুদিন যত্নে রাখা ছিল, বিনয়কাকু দেখতে পেয়ে চাইল। বাবা বললেন, 'তুমি নেবে...', দশ সেকেন্ড বিরতি,'... নাও।' এইটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধি তখন হয়েছে যে, বাবা তাঁর একটা পাঁজর দান করে দিলেন পাড়াতুতো ভাইটিকে।

পঁচিশে বৈশাখে অভিনয় প্রতিযোগিতা। অনেক পাড়া যোগ দিয়েছে। আমাদের পাড়াও নাম লেখাল। কে পরিচালনা, মহলা দেওয়ানো এইসব করবে? কেন... বিনয়দা। বিনয়কাকুর বকুনি খেয়ে, ভালোবাসা পেয়ে ছেলেরা রবীন্দ্রনাথের বিনি পয়সার ভোজের মহলা দিল অনেকদিন ধরে। শেষ সপ্তাহে তো সকাল-সন্ধে রিহার্সাল। নাটক হবার তিনদিন আগে চিঠি পেল বিনয়কাকু—বিশ্বভারতীতে চাকরির ইন্টারভিউ। নাটকের দিন যেতে হবে বোলপুর-শান্তিনিকেতন। ছেলেদের মাথায় হাত। বিনয়দা চলে গেলে নাটক হবে কী করে? গভীর সমস্যা। খুব সহজে, নুন-মাখনো আমলকী চুষতে চুষতে আমাদের অনুবাদ শেখানোর মতো, সমস্যার সমাধান করে দিল বিনয়কাকু।

'দূর দূর চাকরি তো অনেক পাব, নাটকের এমন প্রতিযোগিতা তো রোজ রোজ হবে না...'

বিনয়কাকু গেল না বিশ্বভারতী। পাড়ার ছেলেরা বিনি পয়সার ভোজ করে পুরস্কার জিতেছিল সেবার।

আরেক রকম, ১-১৫ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় এই স্মৃতিকথার দুটি পরিচ্ছেদ প্রকাশিত হয়েছে।

শিল্প ও সমালোচনা

বীরবল রায়

প্রথম যখন মাতৃভাষা শিখতে শুরু করেছিলাম, বেশ মনে আছে, শিল্প শব্দটার অর্থ নিয়ে বেশ চিন্তায় পড়েছিলাম। এমন সর্বব্যাপী, বহু-অর্থবাহী শব্দ বাংলাভাষায় বেশ কম আছে। আমার মাতৃভাষায় চিত্র অঙ্কনও শিল্প, কাঁথার কাজও শিল্প আবার দেশলাই বানানোও শিল্প আর লোহালক্কড়ের জিনিস বানানোও শিল্প। অনেক পরে বুঝেছিলাম, এহ বাহ্য! বাঙালির কাছে কিছু করা মানেই শিল্প! তারপরে জ্ঞান হল যে ঢপ, চপ এবং ঢপের চপও শিল্প, শিল্পসম্মতভাবে দিতে পারলেই এরাও শিল্প-শ্রেণিভুক্ত হতে কোথাও বাধা নেই। এক বাক্যে প্রকাশ করলে বলা যায়, বাঙালি কিছু তৈরি করলেই শিল্প, কখনো কখনো একটু কঠিন কিছু করলে শিল্পের সঙ্গে একটা কলা দেখিয়ে দিলেই হয়। এই শেষ কথাটিতে আবার কেউ Double entendre-এর ছায়া দেখবেন না যেন!

শিবের গীত (এখানে অবশ্য শিল্পের গীত) গাইবার পর এবার আমার ধান ভানার পালা। এখানে আমি কোন শিল্প নিয়ে কথা বলতে চাই? দূর বাবা, তুমি দেখছি বড্ড সেকেলে! শিল্পটা বড়ো কথা কিছু নয়, চলচ্চিত্র হতে পারে, আবার চিত্রও হতে পারে; চপ হতে পারে, ঢপও হতে পারে; আবার পকোড়া বা ক্ষুদ্রও হতে পারে। বাঙালির এই এক দোষ, প্রথমেই তাকে কাহিনির শেষ লাইনের আভাস দিতে হবে, তবেই সে এগোবে। নয়তো, বিশ টাকা খসিয়ে একটা লিটল ম্যাগ পর্যন্ত সে কিনতে রাজি নয়। বাঙালি নাকি বাজার বোঝে না, সব বাঙালি নাকি কম্যুনিস্ট না হোক, সমাজতন্ত্র-অন্ত প্রাণ, এখনও ঢেকুর তুললে সোভিয়েত বা চীন-চীন গন্ধ পাওয়া যায়! আর, এদিকে, হাওয়াই স্যান্ডেল পায়ে, পাজামা-পাঞ্জাবি-গোঁফ-দাড়ি-চশমা পরিহিত, আঁতেল ছোকরার লিটল ম্যাগ-এর এক কপি কিনতে গেলে প্রাণটা হু-হু করে ওঠে, প্রেমিকাকে ফিশ কবিরাজি খাওয়ানোর কথা মনে পড়ে! কেন হে, ওই ছোকরার প্রেমিকার কাছে তার মুখ রাখার দায় নেই তোমার? সব কিছুতেই শুধু নিজের চাহিদাপূরণের কথা ভাবলেই চলবে? মনে নেই, 'আপনারে লয়ে সুখী থাকিতে কেহ অবনী 'পরে আসে নাই' বলে ছোটোবেলায় ভাবসম্প্রসারণ লিখতে হত! বাঙালি হয়ে বাংলা সাহিত্যের জন্য বিশ টাকা খরচা করতে গেলে দিলটা প্রেমিকার জন্য 'ফিস'-'ফিস' করে ওঠে কেন বলতে পারো? কেন জানো? বাজারি অর্থনীতির আদর্শ তোমার হাড়ে-মজ্জায় ঢুকে গিয়েছে, তুমি যতই তা না-মেনে থাকতে চাও।

কেন বাপু, তোমার কাছে আমার এত দায়বদ্ধতা কেন থাকতে যাবে যে তোমাকে শেষ লাইনে কী লিখব সেটা পর্যন্ত জানাতে হবে, তবে তুমি প্রথম লাইন পড়তে শুরু করবে? আবদার দেখো বাবুর! ভগবানের কাছ থেকে এই দায়বদ্ধতা চাও? তিনি যখন-তখন তোমার পটোলডাঙার টিকিট কেটে হাতে ধরিয়ে দেওয়ার হক রাখেন— বিপদে পড়লে ঘ্যানঘ্যান করে তাঁর কাছে পুজো দেওয়া ছাড়া তোমার কিচ্ছুটি করার নেই, তিনি তাঁর বিছুটিফুল রূপ তোমাকে দেখিয়ে দেবেন! রাজনৈতিক দাদা বা দিদির কাছে এত দায়বদ্ধতা চাইবার ক্ষমতা রাখো? তাঁরা তো তোমার ভোটে জিতবার পরে তোমার ওপর যে-কোনো ট্যাক্সো বসাতে পারেন, তুমি সোনামুখ করে সে-ট্যাক্সো ভরে আসতে বাধ্য! টাক রাখার পর হঠাৎ যখন আবার খেয়াল হয় যে চুল রাখতে হবে মাথায়, তখন কি চুলের তেল খুঁজতে গিয়ে দোকানে জিজ্ঞাসা করো যে ঠিক ক'গাছি চুল গজাবে তোমার টাকে? তা হলে বাপু, তোমার এত কিছু প্রত্যাশা আমার কাছেই কেন হে? আমি গরিব কলমজীবী বাঙালি বলে?

যাকগে, আসল কথায় আসা যাক। শিল্প যাই হোক না কেন, যে-ধরনেরই হোক না কেন, যে-কোয়ালিটির-ই হোক না কেন, সমালোচনা হলে বেশ ভালো। নিখরচায় পাবলিসিটি! তখন আর তুমি তোমার শিল্পের কী প্রোডাক্ট বাজারে দিলে, সেটা বড়ো কথা নয়; তখন বড়ো কথা হল সমালোচনার তেল-ঝাল-মশলা দিয়ে শেষমেশ ব্যাপারটা কী দাঁড়াল! সমালোচনা হলেই পাবলিসিটি, আর সেটা হলেই দুরন্ত বিক্রিবাটা, সভায়-কাগজে-ম্যাগাজিনে গেরামভারি আলোচনায় তোমার ওপর আলোকপাত! জমে দই যাকে বলে আর কী! চাই কী, একটা-দুটো পুরস্কার, বা আগামী নির্বাচনে টিকিট!

তুমি ভাই বাঙালি, শুনতে তোমার কানে এটা খারাপ লাগবেই যে তুমিও বাজার অর্থনীতির দাস। মুখ-ব্যাজার কোরো না বাপু, কথাটা সত্যি কথা। তুমিও এখন বিশ্বায়ন বোঝো আর সেই বোঝা-ই তোমার আর বাঙালির কাল (নাকি, এন্তেকাল?) হয়ে দাঁড়িয়েছে! এখন তুমি খবরের কগজ পড়তে গেলে তার 'লে-আউট' আন্তর্জাতিক গুণমান দেখো, বই পড়তে গেলে তার বাঁধাই-ছবি-কাগজ-'ফন্ট' সব দেখে তবে বই হাতে তোলো, মোদীজি বিদেশে 'হাউডি মোদী'-তে তোমার দেশোয়ালি ভাইদের থেকে কতখানি সম্মান পেয়ে এলেন তার চুলচেরা বিচার করো, ছবি কিনতে গেলে আঁকিয়ে বিদেশে কেমন নাম করেছে জানতে চাও।

সে-সব দিন আর নেই, যখন রবিবাবু লিখতেন আর সজনীকান্ত তাঁর সমালোচনা করতেন, যখন গান্ধির সমালোচনা করতেন বিপ্লবীরা, যখন দেশজ শিল্প আর বিদেশি শিল্প নিয়ে বিতর্ক হত; এমনকী, সে-দিনও আর নেই যখন অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি নিয়ে বিদগ্ধ মানুষেরা বিতর্ক করতেন বা নেহরুর সমালোচনা করতেন সেকালের কম্যুনিস্ট নেতারা। আজকের জীবনমুখী বিচারে সে-সব ছিল ভদ্রলোকের ভদ্র ভাষায় আলুনি-মার্কা আলোচনা। সে-সব শিল্পের প্রোডাক্ট বা তার সমালোচনা, সবটাই ছিল গুণীদের সুকীর্তি, তেল-নুন-মশলা দিয়ে তার স্বাদ বাড়াতে হত না! সে-সব ছিল মা-ঠাকুমার রান্নার মতো, ফ্লুরিস-এর কেকে-র মতো, সবকটি উপাদান থাকত ঠিক পরিমাণ মতো, অধিকমাত্রায় কোনো কিছু ঢেলে বা মোড়কের চাকচিক্য বাড়িয়ে তাকে বাজারে ছাড়তে হত না! আর, সেইসব সাহিত্যিক যাঁরা তোমার কাছে মরণোত্তর কদবেল পেয়েছেন, অনাহারে বা অল্পাহারে বা বিনে চিকিৎসেতে মরবার পর, তাঁদের কথা তো ছেড়েই দিলাম।

গরিব, অখ্যাত কলমজীবী হিসেবে একটুকরো অনুরোধ করে ফেলি, ভেবে দেখো। বাঙালির লেখা সাহিত্য যে 'গেলেও বিচিত্রপথে, হয় নাই সে সর্বত্রগামী', তার জন্য বাপু তুমিও তোমার দায়িত্ব এড়াতে পারো না। একেই তো ছেলেমেয়েদের ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে পড়িয়ে পরের প্রজন্মের বাংলার দফারফা করে দিয়েছ, তারপরে তোমার সব কঞ্জুষি শুধু বাংলা বই কেনার বেলাতেই। লেখক যদি লেখা বেচে তার এবং তার সংসারের লোকেদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা না করতে পারে, তবে সে লেখার বাইরে অন্য চাকরি করতে বাধ্য! আর, সেটা যদি কারো কপালে লেখা থাকে, তবে আর যাই হোক, দেবী সরস্বতীর আরাধনায় সে খুব বেশি সময় দিতে পারে না। আর, এটা ভুলে গেলে চলবে না, যে লেখে তাকে পড়তেও হয় নইলে তার কলম দীর্ঘজীবী হয় না। না-পড়ে লেখার চেয়ে পড়ে না-লেখা বরং দেবীর আরাধনার উত্তমতর পথ। সুতরাং, অনুরোধ এই যে খুব বাছাবাছি না করে কিছু বই কেনো। চিন্তা নেই, আমার অখাদ্য রচনা কিনতে বলছি না, সব বাঙালি কলমজীবীর কথা বলছি— ভাগ্যের বিধানে আমি একটি চাকরি করি যার বয়স তিন দশক হতে চলল, আমার আর নতুন করে সাহিত্যকে পেশা হিসেবে নেওয়ার উপায় নেই।

আজ বাজারে সব শিল্পের সব প্রোডাক্টই নেহায়েত বাজারি! অধিকাংশেরই ভিতরে সারবস্তু তেমন কিছু নেই! আর, প্রোডাক্ট-এর রকমফের হল উনিশ-বিশ, আটানব্বই-নিরানব্বই নয়, এমনকী 'যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন' পর্যন্তও বলা যাবে না। চীন দেশের অচিন প্রোডাক্ট নামমাত্র দামে কেনা আজ তোমার আদর্শ— কম দামে কিনে ফেলো, তারপর ক'দিনের মধ্যে সেটার অক্কাপ্রাপ্তি হলে সেটা কুড়াওলার ঝোলায় বিসর্জন দাও।

এই স্বল্পমেয়াদি শিল্পপ্রকল্পে আম্মো বাজার বুঝেছি। সমালোচনা পাওয়াই এখন বাজার ধরার মূল কায়দা। সেটাই সার্থকতা, নইলে কোনো শিল্প বাজারে কাটবে না। সেই সমালোচনার কথা বলতেই এত কথা বললাম। এত 'কথা বললাম' না বলে এত 'বাজে বকা বকলাম' বলাটাই ঠিক হবে। দোষ দিতে পারবে না বাপু, দেশের নেতা-নেত্রীদের কাছ থেকে শিখেছি, বাজে বকাটাই আসল কথা, আসল কথা বলতে গেলে মারধর খেতে হবে। ক্ষীণজীবী, দুর্বল বাঙালি, তোমার কাছে গালি খেলে তেড়ে উলটো গাল দিতে পারি, ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর মার খেয়ে পৈত্রিক প্রাণ দেওয়ার মতো poetry-ক বা patriot-ইক হতে আপত্তি আছে। তাই, বাজে বকার মধ্যে দিয়ে আধুনিক বাজারের মূল কথাটা বললাম। নিতে হলে নিয়ো, নয়তো ফেলে দিয়ো। তবে, আমার কথা রেখেছি, শেষ লাইনে না হোক, শেষ প্যারা-য় এসে তবে আমার মূল প্রতিপাদ্য জানিয়েছি, এই ভরসায় যে তুমি আমার কথঞ্চিৎ সমালোচনা করে এবং আমার লেখা সম্পর্কে গালমন্দ করে আমার বাজার একটুখানি বাড়াবে।

আক্রান্ত ভারতীয় সংবিধানের বুনিয়াদ ধর্মনিরপেক্ষতা

অম্বিকেশ মহাপাত্র

আমাদের দেশের সংবিধান গ্রহণ ও লাগু হওয়ার সত্তর বছর পার হয়ে গেছে। এই বছর ২৬ জানুয়ারি ২০২০ 'প্রজাতন্ত্র-তথা-সাধারণতন্ত্র' দিবস বিশেষ গুরুত্ব সহকারে পালন করা হয়েছে। প্রথামতো প্রশাসনিক স্তরে আনুষ্ঠানিক পালনের পাশাপাশি আপামর জনগণ তথা সাধারণ নাগরিক বিশেষ গুরুত্ব সহকারে পালন করেছেন। এই বছর 'প্রজাতন্ত্র-তথা-সাধারণতন্ত্র' দিবস পালনের বিশেষত্ব হল, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী এবং গুজরাট থেকে নাগাল্যান্ড আপামর ভারতবাসী সাধারণতন্ত্র দিবস বিশেষ গুরুত্ব সহকারে পালন করেছেন। পালনে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা (Preamble) 'শপথ বাক্য' হিসেবে সমবেতভাবে সমস্বরে পাঠ করেছেন। বিগত বছরগুলিতে কখনো জনগণ তথা সাধারণ নাগরিক এইভাবে 'শপথ বাক্য' পাঠ করেছিলেন, মনে পড়ে না। 'শপথ বাক্য' পাঠ এই বছর শুধু 'প্রজাতন্ত্র-তথা-সাধারণতন্ত্র' দিবসের দিনেই নয়। তার আগে থেকেই। ভারতীয় সংবিধান সংশোধন করে নতুন আইন 'CAA' লাগু হওয়ার পর থেকেই। দেশের বিভিন্ন স্থানে ও প্রান্তে, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতির মানুষ দ্বারা ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা সমস্বরে পাঠ হয়ে আসছে। ভারতের সংসদের দুই কক্ষ: নিম্ন কক্ষ লোকসভায় ১০ ডিসেম্বর ২০১৯ এবং উচ্চ কক্ষ রাজ্যসভায় ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ 'Citizenship Amendment Bill (CAB)' পাশ হয়। এবং পরের দিন ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ রাষ্ট্রপতি মহোদয়ের স্বাক্ষরদানের মধ্য দিয়ে সেই বিল 'Citizenship Amendment Act (CAA)'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। গণতান্ত্রিক দেশে কোনোরূপ আলোচনা ছাড়াই আইন প্রণীত হয়েছে! তারপর থেকেই দেশব্যাপী জনগণ তথা সাধারণ নাগরিক ভারতীয় সংবিধান হাতে নিয়ে এবং তার প্রস্তাবনা পাঠের মধ্য দিয়ে শপথ গ্রহণ শুরু করেছেন এবং আজও করে চলেছেন।

আমরা জনগণ তথা সাধারণ নাগরিক জমিদারতন্ত্র, রাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ইত্যাদি শব্দবন্ধ শুনে এসেছি। এই শব্দবন্ধগুলি সম্বন্ধে অল্পবিস্তর বুঝিও। কিন্তু 'প্রজাতন্ত্র-তথা-সাধারণতন্ত্র' বিষয়টা কী? হঠাৎ এই ধরনের তন্ত্রই বা কেন? অনুসন্ধানে যা জানা গেছে, তা এইরকম। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তি ঘটে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। দেশভাগের মধ্য দিয়ে দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ইসলামিক রাষ্ট্র পাকিস্তান এবং প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারত। জনসখ্যার নিরিখে আমাদের দেশ, বলা ভালো উপমহাদেশ ভারত বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে। ভারতের বিপুল সংখ্যক জনগণের ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, পোশাক, খাদ্যাভাস, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈচিত্র্যের ভিন্নতা লক্ষণীয়। এই সকল বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য স্থাপন ও মজবুত করে দেশ পরিচালনার জন্য চাই সেই রকমেরই সংবিধান। সেকারণে গণপরিষদ তৈরি করে সংবিধান প্রণয়নের জন্যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল ড. ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের নেতৃত্বে কমিটির উপর। প্রায় তিন বছর পর প্রায় ২০০০ সংশোধনী ও সংযোজনী গ্রহণের পর, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গণপরিষদ 'ভারতীয় সংবিধান' গ্রহণ করেছিলেন। এবং 'পূর্ণ স্বরাজ দিবস'কে স্মরণীয় করে রাখতে ভারত সরকার ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি 'নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান; বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান' ভারতের সংবিধান চালু করেন। সেই দিন থেকে 'স্বাধীনতা দিবস'-এর পাশাপাশি প্রজাতান্ত্রিক ভারতের 'প্রজাতন্ত্র-তথা-সাধারণতন্ত্র দিবস' মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে।

প্রজাতান্ত্রিক ভারতের সংবিধান অনুযায়ী সকল ভারতবাসীই ভারতের নাগরিক এবং এক অর্থে সকল নাগরিকই দেশের মালিক। ভারতের নাগরিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় জনপ্রতিনিধিগণ রাজ্যে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করেন। এবং 'ভারতের সংবিধান'-এর নামে 'শপথ বাক্য' পাঠ করে প্রত্যেক সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সরকার এবং সরকার নিয়োজিত কর্মীবৃন্দ সেকারণেই Government Servant অর্থাৎ ভৃত্য। এবং সেই

থেকেই যে কথা চালু রয়েছে, তা হল Government is by the people, of the people and for the people।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসনাধীন অখণ্ড ভারতবর্ষের লাহোর কংগ্রেসে জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশদের প্রস্তাব 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস'র পরিবর্তে 'পূর্ণ স্বরাজ'র দাবি-প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন এবং সেই প্রস্তাব গৃহীতও হয়েছিল। এবং পরের বছর ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারি থেকে প্রতি বছর জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে 'পূর্ণ স্বরাজ'-এর দাবি সোচ্চারিত হয়ে আসছিল এবং সাধারণ জনগণের কাছে গ্রহণীয়ও হয়ে আসছিল। যদিও ওই সময়কালে মুসলিম লিগ এবং রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আর এস এস দ্বিজাতি তত্ত্বের পক্ষে ছিলেন; পূর্ণ স্বরাজের পরিবর্তে ইসলামিক রাষ্ট্র এবং হিন্দু রাষ্ট্র চেয়েছিলেন। মুসলিম লিগের ইচ্ছে পূরণ হলেও সংগত কারণে আর এস এস এর দাবি অধরা থেকে যায়।

বর্তমান সময়ে আর এস এস নিয়ন্ত্রিত ভারতীয় জনতা পার্টি পরিচালিত একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন। অধরা ইচ্ছে পূরণে কেন্দ্রীয় সরকার গণতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি পরিহার করে, তড়িঘড়ি নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন CAA প্রণয়ন করেন। এই আইন একাধারে ভারতের সংবিধানের বুনিয়াদ ধর্মনিরপেক্ষতাকে আক্রমণ করছে; দেশকে ধর্মের নামে বিভাজন করতে চাইছে; অপরদিকে দেশের মালিক তথা ভারতের নাগরিককে ফের নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে হবে বলে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। ফলে সাধারণ নাগরিকের জনজীবনের মূল সমস্যাগুলি থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে, প্রত্যেক নাগরিককে অস্তিত্বের গভীর সংকটে ফেলে ভীত-সন্ত্রস্ত করে, দেশে এক চরম অস্থিরতা তৈরি করতে চাইছেন। অর্থাৎ Government Servant সাধারণ নাগরিক তথা মালিকের বিরুদ্ধে মানবতা বিরোধী যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

স্বাভাবিক কারণে দেশ তথা দেশের সংবিধান রক্ষায় আপামর জনগণ তথা নাগরিক দলমত নির্বিশেষে, জাত-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে রাস্তায়। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন গৃহের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত দিল্লি পুলিশ জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে, এমনকী লাইব্রেরির মধ্যে ঢুকে আচমকা ছাত্রদের উপর ফ্যাসিবাদী কায়দায় আক্রমণের পর, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে শাহিনবাগে সাধারণ নাগরিকের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ২৪×৭ লাগাতার বিক্ষোভ প্রদর্শন চলছে। সেই বিক্ষোভে সারা দেশের বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে বিভিন্ন অংশের মানুষ যোগদান করেছেন, করছেন। প্রবল শীতের মধ্যে কার্যত খোলা আকাশের নীচে, সরকারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে, দিনরাত এক করে রাস্তার লড়াইয়ে বহুমাত্রিক বিভিন্ন রঙে রঙিন শান্তিপূর্ণ অভিনব প্রতিবাদ কর্মসূচি চলছে। কে নেই এই কর্মসূচিতে? যাঁরা কখনো ঘর-সংসার হেঁশেল সামলে বাহিরে বেরিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সামিল হননি, সেই মহিলারা হাজারে হাজারে সবকিছু সামলে প্রতিবাদ কর্মসূচির সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে ২৩ দিনের শিশু কোলে মাও রাস্তায়! এমনকী ৯২ বছরের অশক্ত বৃদ্ধাও রাস্তায়। কেবলই জাতীয় পতাকা এবং সংবিধান সঙ্গে নিয়ে। শাহিনবাগ অনুসরণ করে সারা দেশের বিভিন্ন শহরে, নগরে, প্রান্তরে হাজার হাজার মানুষ লাগাতার প্রতিবাদ কর্মসূচিতে। আপনিও রাস্তায় নামুন। আর কিন্তু নয়। বিশ্বের দরবারে আমাদের গর্ব— 'নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান; বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান' ভারতের ঐক্য, অখণ্ডতা, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র এবং সর্বোপরি মানবিকতা রক্ষা করতে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে আপনিও সামিল হন।

মহাত্মার দেখা পাওয়া

অভয় বাং

আমার জন্মের আগেই তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। আমি তাঁকে কখনো দেখিনি; তা সত্ত্বেও, আমার জীবনে বেশ কয়েকবার আমার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে আমার কোনো রক্তের সম্পর্ক ছিল না; তবুও, আমি তাঁর সান্নিধ্য অনুভব করতাম। তিনি যেন আমার ঠাকুরদা— ওই গুঁফো বৃদ্ধ— যাঁর রক্ত আমার ধমনিতে বইছে।

আমার জন্মের আগে থেকেই যেন তাঁর প্রভাব আমার জীবনে শুরু হয়েছিল। আমার বাবা ঠাকুরদাস বাং, তাঁর যৌবনে, মহাত্মার এক সহকর্মীর স্থাপন করা একটি কলেজের শিক্ষক ছিলেন। তিনি সেবাগ্রামের গান্ধি আশ্রম থেকে কয়েক মাইল দূরে এক ছোট্ট শহর ওয়ারধায় বাস করতেন। যেখানে, মহাত্মা তাঁর এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের জীবনকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। সেখান থেকে তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনের কাজকর্ম চালাতেন। তাঁর ডাকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সারা দেশে আন্দোলন শুরু হয়। আমার বাবা ১৯৪২-এর 'কুইট ইন্ডিয়া' আন্দোলনে যোগ দেন। দু বছরের জন্য তাঁর জেল হয়। তিনি যখন মুক্তি পান তখন দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ প্রায় শেষ হচ্ছে। এটিও বোঝা যাচ্ছিল যে ভারত খুব শীঘ্রই স্বাধীনতা পেতে যাচ্ছে। আমার বাবা অর্থনীতিবিদ ছিলেন এবং তিনি তাঁর সারস্বত চর্চা চালিয়ে যাবেন ঠিক করেছেন। তিনি আমেরিকায় যাবেন বলে স্থির করেছিলেন। তিনি পাসপোর্ট বানান এবং ওহাইও বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোশিপও পান। সেই সময়ে বিদেশে যাওয়া জীবনের পরিবর্তনের একটি বড়ো ব্যাপার। বিদেশ যাত্রার আগে বাবা গান্ধির আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য সেবাগ্রামে যান।

গান্ধি আশ্রমের কুঁড়েঘরে মাটির চাতালে বসে ছিলেন একটি পাতলা বাঁশের চাটাইয়ের ওপর। তাঁকে দুই মিনিট সময় দেওয়া হয়েছিল দেখা করার। বাবা সম্ভ্রমের সঙ্গে তাঁর কাছে গিয়ে প্রণাম করলেন। বাবা বললেন, ''বাপু'' (বাপুর অর্থ বাবা। মহাত্মাকে সবাই ওই নামেই সম্বোধন করত)। ''আমি জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি, এবং অর্থনীতিতে আরো পড়াশুনো করতে আমেরিকা যাচ্ছি''। মহাত্মা ওঁর দিকে তাকালেন। বাদামি মুখ, সাদা গোঁফ, চশমা আঁটা। তিনি শুধু একটি বাক্য বললেন, ''তুমি যদি অর্থনীতি জানতে চাও তা হলে আমেরিকায় যেয়ো না; ভারতের গ্রামে যাও''। বলে তিনি লিখতে লাগলেন।

আমার বাবা নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তিনি তাঁর যাত্রা বন্ধ করলেন এবং ভর্তি সংক্রান্ত কাগজপত্র ছিঁড়ে ফেললেন। কয়েক মাসের মধ্যে একটি ছাত্রদলকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামীণ মানুষের মতো গ্রামে বাস করতে গেলেন। গ্রামের মানুষের মতো জীবন যাপন করে চাষির অর্থনীতি বোঝার চেষ্টা শুরু করলেন। তিনি ভূদানের মতো সামাজিক এবং রাজনৈতিক কর্মে, যেমন ভূমিহীন কৃষককে জমি দান এবং গ্রাম কমিয়ুন নির্মাণে, নিযুক্ত হলেন। আজ, ৫৫ বছর পরেও, একই সম্পূর্ণ একাগ্রতায় সেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। যে জ্বালানি তিনি একবার ভরেছিলেন তা কখনো নিঃশেষ হয়নি। আমি বাবাকে একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, ''তাঁর কী ম্যাজিক ছিল যে একটি বাক্যেই আপনার সমস্ত জীবনে পরিবর্তন এসেছিল''?

আমার বাবা আমাকে অন্য একটি গল্প বলেছিলেন। একবার, ভারতের একজন সমাজবাদী পণ্ডিত রামমোহন লোহিয়া তাঁর যুবা বয়সে একটি প্রশ্ন করেছিলেন: ''বাপু, আপনি তো বৃদ্ধ। শোনা যায় না এমন এক একঘেয়ে মৃদু স্বরে আপনি বক্তৃতা দেন। কিন্তু, আমরা যুবা সমাজবাদীরা আগুনখেকো পণ্ডিতি ভাষায় বক্তৃতা দিই। অথচ, ভারতের মানুষ আপনাকে অনুসরণ করে আমাদের নয়। আপনার ম্যাজিক কী''? বাপু বললেন, ''পুত্র, আমি ঠিক জানি না। কিন্তু, একটাই কারণ আমি ভাবতে পারি। তা হচ্ছে, আমি কখনো জনগণকে এমন কিছু করতে বলি না যা আমি নিজে আমার জীবনে প্রয়োগ করিনি। আমার মনে হয় ভারতের মানুষ এই পার্থক্যটা বুঝতে পারে''। আরেকবার, যখন তাঁকে মানুষের জন্য একটি বাণী দেওয়ার কথা বলা হয় তখন তিনি বললেন ''অন্য কী বাণী দেব। আমার জীবনই তো আমার বাণী''।

এটি এক আশ্চর্যজনক জোরালো দাবি। এইরকম কথা

বলার নৈতিক শক্তি তাঁর ছিল। কারণ, বলা এবং কাজের মধ্যে তাঁর কোনো ফাঁক ছিল না। কোনো ব্যক্তিগত লুকোনো স্থান ছিল না। তিনি সত্য বলতেন এবং জীবনে আচরণ করতেন। অনেক বিজ্ঞানী, পণ্ডিত এবং দার্শনিকরা সত্য কথা বলেন। জীবনে পালন করাই ছিল তাঁর ম্যাজিক। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল। আলবার্ট আইনস্টাইন বলেন, "The generations to come will scarce believe that such a one, in flesh and blood, ever walked on this earth"। আমি সেই ভবিষ্যৎ বংশধরদের একজন। তিনি যে এই পৃথিবীতে আছেন তা বিশ্বাস করতে আমার কোনো অসুবিধে ছিল না। আমি তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছি।

আমি আমার শৈশব সেবাগ্রামে তাঁর আশ্রমে কাটিয়েছি যেখানে কয়েক বছর আগে তিনি বাস করেছেন, হাঁটাচলা করেছেন এবং শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর ছায়া যেন এখনও রয়ে গেছে। আশ্রমের যে বিদ্যালয়ে আমি পড়াশুনা করেছি তা তিনি স্থাপন করেছেন। তিনি এমন এক শিক্ষা পদ্ধতি চালু করবার স্বপ্ন দেখেছিলেন যা এক নতুন মানুষ নির্মাণ করবে। তিনি তাঁর পদ্ধতির নাম দেন 'নই তালিম' বা নতুন শিক্ষা। সেখানে শিশুরা মাথা, হৃদয় এবং হাত ব্যবহার করবে। এক সম্পূর্ণ মানুষ নির্মাণ হবে। তাই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। শিশুরা কাজ করে এবং সেইরকম জীবনযাপন করে শিখবে। তাই ছিল তাঁর দ্বিতীয় পদ্ধতি। প্রত্যেক শিশু সমাজের উপযোগী কোনো একটি উৎপাদনের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। এবং, তৃতীয় পদ্ধতি হল শ্রমের মধ্য দিয়ে খাদ্য উপার্জন। কতকগুলি তথ্য আহরণ করার চেয়ে নৈতিক বোধ শিক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটি ছিল তাঁর চতুর্থ নীতি। তিনি একবার বলেছিলেন, "Nayi Taleem will be my greatest gift to India"। আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতি ছিল এইরকম। প্রতিদিন আমরা ২-৩ ঘণ্টা কায়িক শ্রমের কাজ করতাম- কখনো মাঠে, কখনো রান্নাঘরে অথবা গোশালায়। প্রতিটি কাজে আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতাম।

আমার বয়স যখন ১২ তখন আমাকে সাধারণের জন্য রান্নাঘরে কাজ দেওয়া হল। মহাত্মা পথ্যের পরীক্ষক ছিলেন। সেইজন্য তিনি রান্নাঘরে কাজ করতে ভালো বাসতেন। তা ছাড়া, এই কাজে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সাম্য অনুভূত হত। তাই, যখন নেহেরু, প্যাটেলের মতো রাজনৈতিক নেতা কিংবা ব্যারিস্টার তাঁর সঙ্গে দেশের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে আসতেন তখন তিনি তাঁদের রান্নাঘরে তাঁর সঙ্গে সবজি কাটতে আমন্ত্রণ জানাতেন। তাঁরাই পরে কেউ প্রধানমন্ত্রী, উপপ্রধানমন্ত্রী বা স্বাধীন ভারতের সভাপতি হয়েছিলেন। আমাকে রান্নাঘরে কাজ দেওয়া হয়েছিল।

একটি গরিব গ্রামবাসী যে খাদ্য রোজ খায় আমাদের সেইমতো সীমিত বাজেটের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্যের পরিকল্পনা করতে হত। তা হলেও, ওই খাদ্য ভোজনকারীর কাছে উপাদেয় হতে হত। এটি ছিল খুবই কঠিন আদেশ। আমরা দিনের বেলা রান্না করতাম, সন্ধেতে রাত্রের খাওয়ার দিতাম এবং রাত্রে পথ্য বিজ্ঞান ও পুষ্টি নিয়ে পড়াশুনো করে পরের দিনের খাদ্যের পরিকল্পনা করতাম। কোন ডালে কত প্রোটিন আছে তার হিসেব করতাম। এটাও পড়তাম কোন সবজিতে কত পরিমাণে কত ভিটামিন আছে। মেডিক্যাল কলেজে পড়ার চেয়ে আমি ওই রান্নাঘরে পুষ্টি বিষয়ে অনেক বেশি শিখেছিলাম।

আমাদের প্রত্যেককে একটু ছোটো জমি দেওয়া হয়েছিল। সেখানে আমরা কী শস্য রোপণ করব তার পরিকল্পনা করতাম, চারা রোপণ করতাম, দেখাশুনো করতাম, ফসল কাটতাম এবং তা বিক্রিও করতাম। ''মাটি কী রকম? কোনরকম সার লাগবে? তার মধ্যে কী কী রাসায়নিক পদার্থ আছে? আমি রসায়ন, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, উদ্যানবিদ্যা এবং অর্থনীতি শিখেছিলাম। ওই ছোট্ট জমি চাষ করার মধ্যে দিয়ে। আমি বেগুন, ঢেঁড়শ রোপণ করেছিলাম। অনেক কম্পোস্ট, গরুর পেচ্ছাপ দিয়ে তাদের দেখভাল করতাম যাতে অনেক নাইট্রোজেন থাকে। বেগুন গাছ সাধারণত ২ ফুট লম্বা হয়। কিন্তু, আমার বেগুন গাছ ৬ ফিট লম্বা হল। আমি মাত্র ৪ ফুট লম্বা। তাই আমি যখন আমার বেগুন খেতের মধ্যে দিয়ে হাঁটতাম তখন মনে হত আমি যেন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটছি। বেগুনের সাইজও খুব বড়ো হত। একটি বেগুনের ওজন ১.৭৫ কেজি হয়েছিল। সেটি বাজারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিন্তু সেটি কেউ কিনতে চায়নি। ক্রেতারা বলছিল ''আমারা সারা সপ্তাহ ধরে একটি বেগুন খেতে পারব না''। আমার বেগুনকে ফেরত আনা হয়েছিল। আমরা আমাদের কমিউনিটি রান্নাঘরে সেটি রান্না করি। তা ২০ জনের পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

আমরা প্রার্থনার মধ্যে দিয়ে গান শিখেছিলাম। সাহিত্য এবং কবিতার পড়া কখনো গাছের নীচে বা গাছে চড়েও হত। সমাজ বিজ্ঞান এবং দক্ষতা শিখতাম গ্রাম পরিভ্রমণে যখন আমরা ভূমিহীন গরিব মানুষের জন্য ভুদান আবেদনে যেতাম। ওটি ছিল ভ্রাম্যমাণ বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি আমাদের মধ্যে নেই কিন্তু তিনি এখনও আমাদের শিখিয়ে যাচ্ছেন।

আমি এবং আমার দাদা উভয়ে ওই বিদ্যালয়ে পড়েছিলাম। একদিন, একটি পাহাড়ের পাশ দিয়ে সাইকেল চালিয়ে যাবার সময় আমরা ঠিক করলাম যে আমরা বড়ো হয়েছি, আমার বয়স ১২, আমরা আমাদের জীবন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেব। আমরা কী হব? আমরা ভাবছিলাম ভারতের গ্রামের কী প্রয়োজন। খাদ্য ও ওষুধ। ঠিক হয়ে গেল। আমার দাদা চাষিদের সাহায্য করবার জন্য শিখরে কৃষি এবং গ্রামের রোগীকে চিকিৎসা করার

জন্য আমি শিখব ডাক্তারি। মহাত্মা আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু, আমি কি তা বলতে পারি? ওই সিদ্ধান্ত নিতে কে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন?

আমি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হলাম এবং সেদিন থেকেই আমি আমার স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করা শুরু করলাম। মেডিক্যাল কলেজ আমাদের নিজেদের স্বাস্থ্য সুস্থ রাখার ব্যাপারে শিক্ষা দেয় না। কোনো ব্যায়াম করা হত না, ভারসাম্যহীন খাওয়াদাওয়া এবং সময় ও কাজের চাপ। আমি মেধাবী শিক্ষায় নিজেকে নিয়োজিত করলাম। গান্ধি ধীরে ধীরে আমার মনের থেকে দূরে সরে গেলেন। আমি খুব একজন মেধাবী ডাক্তার হতে চাইলাম। বহু বছর কেটে গেল। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলাম। আমি মেডিসিনে আরো উচ্চ শিক্ষা নিতে আগ্রহী ছিলাম। তার জন্য ভালো প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই আমি ভারতের একটি বিখ্যাত পোস্ট গ্র্যাজুয়েট প্রতিষ্ঠানে পড়তে শুরু করলাম। আধুনিক মেডিক্যাল বিজ্ঞানের যে বিস্ময়কর প্রযুক্তিগত উন্নতি তা মোহময়।

কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমাকে কিছু খোঁচা দিচ্ছিল। আমি সুখী হচ্ছিলাম না কেন? আমার এই চঞ্চলতা কেন? ''কার জন্যে তুমি এই শিক্ষা নিচ্ছ? এই উন্নত প্রযুক্তিগত মেডিক্যাল শিক্ষার পর তাকে প্রয়োগ করতে গেলে তোমার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে আমেরিকা যাওয়া''। পোস্টগ্র্যাজুয়েট শিক্ষার পর বেশিরভাগ ডাক্তার তাই করে। তাদের ৯০ শতাংশ আমেরিকায় যায়। ''তুমিও কি সেখানে যেতে চাও? ভারতের গ্রামবাসীদের কী হবে''? আমি ঘুমোতে পারছিলাম না। বোধহয় কোনো একটি বিরাট ভুল হচ্ছে। আমার ভেতরকার কষ্ট বাড়তে থাকল। ''আমি কী করব''? আমি উচ্চ শিক্ষার জন্য সারা ভারতীয় এক পরীক্ষা দিলাম। ওই পরীক্ষার ফল বেরোবার আগেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম। জাতীয় পরীক্ষায় আমি প্রথম স্থান অধিকার করেছিলাম। ওই ইনস্টিটিউটের ডিরেকটার যাঁর দেশে বিরাট খ্যাতি তিনি বিশেষভাবে আয়োজিত একটি সভায় আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ''তুমি কোন বিশেষত্ব বাছতে চাও''? আমি বললাম, আমি ইনস্টিটিউশন ছাড়তে চাই। আমি একটি আদিবাসী অঞ্চলে যাচ্ছি নিজেকে ব্যবহার করার জন্য। মহাত্মা কুড়ি বছর আগে মারা গিয়েছেন। কিন্তু, আমি কি তা বলতে পারি? তিনিই কি আমার অন্তরের কণ্ঠস্বর ছিলেন না?

আরও ১৫ বছর কেটে গেল। আমি আর আমার স্ত্রী রানি মধ্য ভারতের সুদূর আদিবাসী অধ্যুষিত জেলা গড়চিরোলিতে একটি কমিউনিটি স্বাস্থ্য ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করেছিলাম। আমরা ১০০টি গ্রামের সংক্রামক রোগের স্বাস্থ্য সমস্যা স্টাডি করছিলাম এবং তার গ্রামভিত্তিক সমাধান প্রয়োগ করছিলাম। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে গ্রামবাসীরা যাতে স্বাবলম্বী হতে পারে তার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলাম। পশ্চিমের বিশেষ ডাক্তারি জার্নাল ল্যান্সেটে (Lancet) আমাদের গবেষণা প্রায়ই প্রকাশিত হত। বিশ্ব জনস্বাস্থ্য এজেন্ডায় স্ত্রীরোগ সমস্যাকে আনার জন্য এবং শিশুদের নিমুনিয়ার বিরুদ্ধে গ্রামভিত্তিক সমাধান বার করার জন্য আমাদের সুনাম হয়। কাজটি বেশ ভালোভাবে চলছে।

ডাক্তারি করার সময় আমি মদ্যপ মানুষের দেখা পেতাম। আমি তাদের খুব কমই সাহায্য করতে পারতাম। তাই আমি তাদের এই সমস্যা নিয়ে খুব একটা ভাবনা চিন্তা করতাম না। নিজের কাজে মনোযোগ দিলাম। একটি শীতের রাতে আমরা কাছে খুব কলহের আওয়াজ শুনতে পেলাম। খুব চিৎকার, হল্লা, গালাগালি ও বিলাপ করে কান্না। কোনো যাযাবর পরিবার আমাদের বাড়ির কাছের মাঠে টেন্ট ফেলেছে। এইরকম পরিবারে বউকে পেটানো প্রায়ই ঘটে। পরদিন সকালে আমরা একটি বিহ্বল মার খাওয়া মহিলাকে দেখতে পেলাম। তার ৭ সন্তান তার পেছনে লুকোবার চেষ্টা করছে। তার স্বামী যে প্রায়ই মদ্যপ থাকত, তার বউকে এবং ছেলেপিলেকে নির্দয় ভাবে পেটাত, টেন্ট এবং বিছানাপত্তর পোড়াত এবং সেখান থেকে তাদের ফেলে রেখে চলে যেত। সেটি ছিল ডিসেম্বরের রাত। স্ত্রীলোকটি তার শিশুদের সঙ্গে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে। টেন্ট ছাইয়ে পরিণত হয়েছে।

রানি মেয়েটিকে কয়েকটি কম্বল এবং শিশুদের জন্য জামাকাপড় দিল। কিন্তু, আমরা জানতাম সেটি একটি অনুপযুক্ত সমাধান। ''আমি কী করব? মাদকে আসক্তি আমার পেশার সমস্যা নয়। এটি একটি সামাজিক সমস্যা''। আমি নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। আমি যতই সমস্যাটিকে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করি ততই তা আমার কাছে ফিরে ফিরে আসে। ''তোমাকে একটি Talisman দেব''। সে একবার নিজের আত্মাকে বলেছিল, ''যখন কোনো সংশয় হবে তোমার পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তখন সেই দুর্গত মানুষ যাকে তুমি তোমার চোখের সামনে আনো এবং নিজেকে জিজ্ঞেস করো, ''ওর সম্বন্ধে যে পরবর্তী পদক্ষেপের কথা তুমি ভাবছ তা কি তাকে কোনো সাহায্য করবে? তা কি তাকে তার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবে?'' Richard Attenborough-র 'গান্ধি' সিনেমার একটি বিশেষ দৃশ্য আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। নদীর ওপারে গান্ধি এক সহায়হীন অর্ধ উলঙ্গ নারীকে দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর মাথায় লম্বা পাগড়িটি তার দিকে জলে ভাসিয়ে দিলেন।

ওই talisman আমার সংশয় মিটিয়ে দিল। আমরা গ্রামে গিয়ে মহিলাদের দলের সঙ্গে এক এক জনের সঙ্গে আলাদা

আলাদাভাবে কথা বলতে শুরু করলাম। তাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে পুরুষদের মদ পান করার অভ্যাস। পরিবারের কাছে প্রায় কোনো অর্থই পৌঁছাত না। ভালো স্বামী বা পিতা সন্ধেতে শয়তান হয়ে ওঠে। মদ্যপানের জন্য স্বামীর মৃত্যুতে কোনো কোনো নারী কান্নাকাটি করত। আবার, এমনও মহিলা ছিল যারা কান্নাকাটি করত কেন তাদের মদ্যপায়ী স্বামীর মৃত্যু হয় না। গড়চিরোলিতে মদ্যপান ছিল সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ।

এই সমস্যার সমাধান কী? এ ব্যাপারে পুরুষদের কোনো বোধ ছিল না। সরকার মদ বিক্রিতে উৎসাহিত করত। কেননা তাতে রাজস্ব বেশি বাড়ে। এ ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা খুবই কম। আমার ডাক্তারি শিক্ষায় এই রোগ সারাবার কোনো ট্রেনিংই দেয়নি। তাই আমি তাঁর কাছে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিলাম। মদ্যপানের ব্যাপারে তাঁর লেখা পড়তে শুরু করলাম। মদ্যপানের বিরুদ্ধে তিনি নানা পন্থা দেখিয়েছেন। সমাজকে আবার গড়ে তোলার জন্য মদ্যপান নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন। তিনি মদ বিক্রির বিরুদ্ধে পিকেট করে আন্দোলন শুরু করলেন।

আমরা গড়চিরোলিতে সাক্ষ্য জোগাড় করতে শুরু করলাম। আমরা দেখলাম যে গড়চিরলির মতো অনুন্নত জেলার জন্য বাৎসরিক উন্নয়নের খাতে সরকারের বাজেট হচ্ছে ১৪ কোটি টাকা। যেখানে এই জেলায় বছরে মদের বিক্রির পরিমাণ হচ্ছে ২০ কোটি টাকা। আমরা যখন গ্রামে গ্রামে এই তথ্য নিয়ে গেলাম তখন একটি শিশুও দারিদ্র্যের অঙ্ক বুঝতে পারল। আমরা এটিও আবিষ্কার করলাম সরকার মদ বিক্রি করার যে লাইসেন্স দিয়েছে তা নিয়ম বহির্ভূত। কারণ, কেন্দ্রীয় সরকার অনেক আগেই নিয়ম করেছে যে আদিবাসী জেলায় কোনো মদ বিক্রি করা যাবে না কেননা আদিবাসীরা খুব সহজেই সুরাসক্ত হয়।

গান্ধিজির যে তৃতীয় অস্ত্র তা হচ্ছে তাঁর আইন অমান্যের টেকনিক— যদি সরকার ভুল কাজ করে তা হলে তার প্রতিবাদ করা। ছয় বছরে গড়চিরোলির গ্রামে গ্রামে সামাজিক আন্দোলন গড়ে উঠল নিজেদের সুরাসক্তি থেকে মুক্ত করার জন্য। ১৫০টি গ্রাম সামাজিক নিষেধ জারি করল। এক ফোঁটা মদও গ্রামে ঢুকতে পারবে না। ৬০০ গ্রাম থেকে ৩৫৩টি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ মানুষ সরকারের কাছে দরখাস্ত পাঠাল।

কিন্তু, সরকার নাছোড়বান্দা। তাই আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ নিলাম। গান্ধিজির জন্মদিন ২রা অক্টোবরে আমরা জেলা স্তরে এক সভার আয়োজন করলাম। দশ হাজার গ্রামবাসী সেই সভায় যোগদান করল। তার অর্ধেক ছিল আশাবাদী মহিলা। ওই একজন পরিত্যক্ত যাযাবর মহিলা এখন সংখ্যায় কয়েক হাজার গুণ হয়ে গেছে। ওই সভা ঘোষণা করে যে ওইদিন থেকে জেলায় নেশা মুক্তির ব্যাপারে জনসাধারণের নিয়ম চালু হল। মদ বিক্রির ব্যাপারে সরকারের অধিকার ও নেশা করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হল।

পিকেটিং শুরু হয়ে গেল। সামনের সারিতে রইল যুবক যুবতীরা এবং মেয়েরা। আমাদের চার ও দশ বছরের পুত্ররা আমাদের সঙ্গে কারারুদ্ধ হল। তারা যখন তাদের ক্লাসের বন্ধুদের ওই প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করতে নিয়ে এল তখন আমরা তাদের ফেরত পাঠিয়ে দিলাম তাদের পিতামাতার সম্মতির জন্য। আশ্চর্যের ব্যাপার যে বেশিরভাগ ফিরে এল তাদের পিতামাতার সম্মতি নিয়ে। তাঁরা বললেন, 'তোমরা যদি নেশামুক্তি আন্দোলনে কারারুদ্ধ হও তা হলে আমাদের কোনো আপত্তি হবে না'। মহাত্মা একবার বলেছিলেন, 'আমায় যদি একদিনের জন্যও ভারতের শাসক করা হয় তা হলে আমি দেশের সমস্ত মদের দোকান বন্ধ করে দেব'। তাঁর 'ভূত' গড়চিরোলিতে আমাদের সক্রিয়ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। শেষপর্যন্ত সরকার হার স্বীকার করল। জেলায় মদ বিক্রি বন্ধ হল। সমস্ত মদের দোকান বন্ধ হল এবং লাইসেন্স বাতিল হল।

১৯৯৫ সালের ১৮ এপ্রিল সকালে বেড়াতে বেরিয়ে বুকে প্রচণ্ড ব্যাথা অনুভব করলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝলাম যে আমার করোনারি হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে। আমার বয়স তখন ৪৪। এই ঘটনায় আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া হল অবিশ্বাস এবং সন্ত্রাস। 'এটি আমার কী করে হতে পারে? আমায় কেন'? আসন্ন মৃত্যুর এক ভয়ংকর মানসিক যন্ত্রণা আমাকে গ্রাস করল। ভাবছি 'হে ভগবান, আমি এখনও জীবন শুরুই করিনি! আমার স্ত্রী রানি, দুই পুত্র আনন্দ ও অস্রুত তাদের কী হবে? আমার বাবা মা কী করে তা সহ্য করবেন? আমাদের প্রতিষ্ঠান সার্চ এবং মদ্যপানের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলনের কী হবে? এইসবের কী হবে? আমি এত শীঘ্র কী করে প্রয়াত হব, এত হঠাৎ'?

মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ায় ব্যাপারে আমি একেবারে অপ্রস্তুত ছিলাম। এতদিন বেঁচে থাকাটাই সত্য বলে মেনে নিয়েছিলাম। সত্যিকারের জীবন যাপন তো এখনও শুরুই হয়নি। আমার বয়স তো এখন মাত্র ৪৪। আমি স্বাস্থ্যের দিকে কখনো নজর দিইনি। রোগভোগ ও মৃত্যুর বিপদের কথা কোনোদিন ভাবিনি। আমি সবসময় ভাবতাম, 'আমি শীঘ্রই একদিন নিজের সম্বন্ধে সাবধান হব'। আমার মৃত্যু আসন্ন এবং আমি বিছানায় অসহায়ভাবে শুয়ে আছি।

তখনও যখন আমি হাসপাতালের বিছানায় আমি একটি বই পেলাম। ডিন অরনিসের লেখা বই রিভারসিং হার্ট ডিজিস। আমার যেন নিয়তির সঙ্গে এক অভিসার হল। আমি তিন মাস আগে ডাক্তার হিসেবে এই বইটি পড়বার জন্য অর্ডার দিয়েছিলাম। বইটি এল এমন সময়ে যখন রুগি হিসেবে বইটির আমার প্রয়োজন। বইটি সত্যি আমাকে বাঁচার আশা এবং সাহস

জোগাল। নিজের স্বাস্থ্যের শুশ্রূষার একটি পুরো প্রোগ্রাম দিল বইটি। ওইভাবে চললে যে সুফল দাবি করা হচ্ছে তার বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য সহ তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। চর্বিযুক্ত খাদ্যের ওপর কঠোর সংযম, দিনে ২৫ গ্রাম তেল। চিনি, পশু চর্বি সম্পূর্ণ বন্ধ এবং সবজি, ফল, বিন্স, অঙ্কুরিত ছোলা ও ডাল খাদ্যে বেশি করে গ্রহণ করা। প্রত্যহ জঙ্গলে আধ ঘন্টা প্রাতঃভ্রমণ করা, আধ ঘন্টা যোগাসন, প্রাণায়াম করা। ১৫ মিনিট ধ্যান এবং দিনে দুবার শবাসন করে রিল্যাক্স করা।

আমার কাছে এটি ছিল বেঁচে থাকার জন্য এক অদম্য প্রচেষ্টা। একই সঙ্গে এটি ছিল আমার গান্ধি আশ্রমের জীবনে ফিরে যাওয়া। অরনিশের চিকিৎসায় যে জীবনাচারণ বলা আছে তার অনেকটাই গান্ধিজির আশ্রমে পালিত হত। সেখান থেকে আমি পঁচিশ বছর আগে বেরিয়ে এসেছি বিশেষ করে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ার পর। সেখানে আমি এক অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন শুরু করলাম। কোনো ব্যায়াম নেই, পরিস্রুত কার্বোহাইড্রেট ও চর্বিযুক্ত খাদ্য খাচ্ছি এবং ডাক্তারিতে সাফল্য অর্জন করার জন্য মানসিক চাপ। ৪৪ বছরে বয়সে আমি তার ফল ভোগ করছি। আমি প্রতিদিন সকালে বাগানে হাঁটার সময় আর একটি দিন বেঁচে থাকতে পারার জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব করতাম। এটি ছিল দান, অনুগ্রহ। আমি এটি অর্জন করিনি। আমি বাগানে দাঁড়িয়ে যখন গাছগাছালি, আকাশ দেখছিলাম এবং বাতাস অনুভব করছিলাম তখন আমি এক গভীর একাত্ম বোধ করছিলাম।

এইরকম বোধ আমার এই প্রথম হল করোনারি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি টেবিলে শুয়ে। আমার অ্যাঞ্জিওগ্রাফিতে আমার বাঁ করোনারি ধমনিতে ৯৫ শতাংশ ব্লক দেখা গিয়েছিল। আমার করোনারি ধমনির ব্লক যখন ডাইলেট করবার চেষ্টা করা হচ্ছিল কারডিয়লজিস্ট অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি বেলুনে চাপ বাড়িয়ে দেন। সাধারণ বায়ুর চাপের এক, দুই, তিন গুণ। কিন্তু, ব্লক খুলল না। শেষ চেষ্টায় তিনি চাপ ছয় গুণ বাড়িয়ে দিলেন। হঠাৎ ধমনির ভেতরের দেওয়াল ভেঙে পড়ল। কিছুটা ছিঁড়ে গেছে। ঘরের প্রত্যেকের নিশ্বাস বন্ধ। আমার বাঁদিকের করোনারি ধমনিতে কী ঘটছে আমি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি। এর অর্থও বুঝছিলাম। 'আমার মৃত্যু বোধহয় আসন্ন। এটিই বোধহয় আমার শেষ হৃৎস্পন্দন''। কিছুক্ষণের জন্য আমি খুব আশঙ্কিত এবং ভীত হয়েছিলেন। এবং তখন, হঠাৎ আমার মনে দুটি চিন্তাধারা প্রবাহিত হল। এক হচ্ছে ঈশোপোনিসদের সেই প্রার্থনা যা আমরা সেবাগ্রাম আশ্রমে প্রতিদিন সকালে গাইতাম:

ওম পূর্ণমদ, পূর্ণমিদম, পূর্ণাৎ পূর্ণমুদাচ্ছায়াতে,
পূর্ণস্য পূর্ণমদায়, পূর্ণমেভভিসিস্যতে!
(এই বিশ্ব পূর্ণ, যে শক্তি তাকে সৃষ্টি করেছে সেও পূর্ণ, সে অসীম, তার বৃদ্ধিও নেই বিনাশও নেই, তা সবসময় বিদ্যমান। শান্তি বিরাজ করুক)

দ্বিতীয় যে ধারা তা এল আধুনিক পদার্থবিদ্যা থেকে। 'এই বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে যখন বিগ ব্যাং অসীম শক্তিকে মুক্তি দিল যা জমে প্রাথমিক কণার জন্ম দিল-ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদি। সবকিছুই এইসব কণা বা শক্তি দিয়ে তৈরি। আমার শরীর, আমার অস্তিত্বও এই সবের সমাহার। আমার মৃত্যু হলেও পরমাণু থেকে যাবে হয়তো এক অন্যরকম সমাহারে। আমি বিগ ব্যাং-এর সঙ্গে জন্ম নিয়েছিলাম এবং আমি অনন্ত কালের জন্য এইসব কণা হয়ে রয়ে যাব। আমি অবিনশ্বর। তাই মৃত্যু কী? তা কেবলই অনু-পরমাণুর নতুনভাবে সংযুক্ত হওয়া''। আমার ভয় কেটে গেলে আমি। আমি মৃত্যুর জন্য তৈরি। পরের তিন ঘন্টা ডাক্তাররা আমার করোনারি ধমনি ঠিকঠাক করায় ব্যস্ত। কিন্তু, আমি পুরো শান্তিতে। পঞ্চম দিনে আমি হাসপাতাল থেকে আবার জীবন্ত ছাড়া পেলাম।

আমার স্বাস্থ্য ফিরে আসতে শুরু করল। এই যে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমি এলাম তা আমার মনে একটি ইচ্ছে ও খোঁজ জন্ম দিল যাতে আমি গত কয়েক বছর ধরে নিযুক্ত আছি। যে মূল প্রশ্ন আমায় ভাবাচ্ছিল তা হল 'ঈশ্বর আছে কি? তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী? যুক্তিবাদী মনের ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। এর উত্তর পাওয়ার জন্য আমার বেশি সময় ছিল না। আমি যতদিন বেঁচে আছি তা জানবার নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। মহাত্মা গান্ধির আত্মজীবনী আবার পড়ব। গান্ধির আত্মচরিতের একটি ছোট্ট বক্তব্য আমার কাছে হঠাৎ এক নতুন অর্থ উন্মোচন করল। ওই গ্রন্থে তিনি তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত লেখক রোমা রোঁলার এক সাক্ষাৎকারের বর্ণনা দিয়েছেন। ঈশ্বর সম্বন্ধে এক প্রশ্নের উত্তরে গান্ধি বলছেন, 'ঈশ্বর একজন মানুষ না। তিনি হচ্ছেন একটি আদর্শ'। আমি আমার উত্তর পেয়ে গেলাম। ঈশ্বরকে একজন দেবতা বা মূর্তি হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে আমার যে সংশয় ছিল তা হঠাৎ দূর হয়ে গেল। যদি সত্যের আদর্শই ঈশ্বর হয় তা হলে তাকে খুঁজতে হবে এবং অভিজ্ঞতা ও অনুভবে আনতে হবে। সত্য সর্বব্যাপী; তাই ঈশ্বরও সর্বব্যাপী। এই চিন্তাস্রোত 'ঈশ্বর' সম্বন্ধে আমার যে যুক্তিবাদী সন্দেহ তা দূর করল। এই ভাবনা আমার আধ্যাত্মিক এবং বৈজ্ঞানিক ভাবনার মধ্যে এক সাযুজ্য খুঁজে পেল। দুটিই সত্যের সন্ধান করছে। অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি টেবিলে বোধহয় আমার এই সত্যের একটি ক্ষীণ বোধ আলোকিত হয়েছিল, 'একটি মানুষ সমগ্রের অংশ যাকে আমরা 'বিশ্ব' বলি। মানুষ দেশ ও কালের অংশবিশেষ। সে নিজেকে অভিজ্ঞতায় বুঝতে চায়, তার চিন্তা ও অনুভব অন্যদের থেকে আলাদা। এ যেন তার চেতনার এক প্রকারের দৃষ্টিবিভ্রম। এই বিভ্রম যেন একটি জেলখানা। যা

আমাদের বন্দী করে রাখে আমাদের নিজস্ব আকাঙ্খা এবং নিজেদের চারপাশের কাছের মানুষের মধ্যে। এই বন্দিদশা থেকে নিজেদের মুক্ত করে আমাদের চারপাশের সমস্ত জীব ও প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি সহানুভুতি অনুভব করতে হবে'। আলবার্ট আইনস্টাইন

আমি যখন ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ছিলাম তখন রানি আমায় জিজ্ঞেস করল আমার কিছু হয়েছে কি, আমার কোনো বিশেষ ইচ্ছা আছে কিনা। আমি বললাম যে আমার দেহ হিন্দু মতে পুড়িয়ে দেওয়ার পর আমার ছাই যেন সেবাগ্রাম আশ্রমে বাপুর কুটিরের কাছে কোথাও পুঁতে দেওয়া হয়।

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আমি সর্বপ্রথম সেবাগ্রাম আশ্রমে গেলাম। এটি হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে আমি বড়ো হয়েছিলাম। যেসব গাছের সঙ্গে আমি বড়ো হয়েছিলাম তারাও এখন সেখানে আছে। গাছের পাতারা বাতাসে দুলছে। গাছেরা যেন হেসে হেসে আমার সঙ্গে কথা বলছে। আমি মারা গেলে এইসব গাছের নীচে আমার ছাই পোঁতা হত। মারা গেলেও ওই গাছে এবং তার ডালে আমার অস্তিত্ব বজায় থাকত। আমি গান্ধির কুঁড়েঘরে গিয়ে বসলাম, চোখ বন্ধ করলাম। সময় বয়ে যেতে লাগল। এখন আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে তিনি আছেন। মাটিতে বসে তাঁত ঘোরাচ্ছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বাপু, আমি কি ভুল করেছিলাম'? তিনি যেন বললেন, 'ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করো' এবং চরকা কাটতে থাকলেন। আমি তাঁকে ডিস্টার্ব না করে নীরবে বেরিয়ে এলাম।

আজ আমি কখনো কখনো ওই সাক্ষাতের কথা ভাবি। আমি কী দেখেছিলাম বা শুনেছিলাম? আমার সঙ্গে কে কথা বলেছিল? আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য তিনি এতদিন পরে ফিরে এলেন? তখন আমি বুঝলাম যে তিনি কখনো আমার জীবন থেকে চলে যাননি। তিনি সবসময় আমার রক্তে, আমার হাড়ে উপস্থিত আছেন। গভীরে গেলে আমি আমার চৈতন্যে বিরাজ করি। আমার চৈতন্য, আপনার চৈতন্য, গান্ধীর চৈতন্য এবং বিশ্বজননী চৈতন্য-ঈশ্বর—সবই এক। এটি কিছু আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে আমার সঙ্গে তাঁর প্রায়ই দেখা হয়।

ভাষান্তর: সমর বাগচি

চিঠির বাক্সো

আরেক রকম, ১৬-২৯ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় এবং সমসাময়িক পড়ে খুব ভালো লাগল। একদিকে দিল্লিতে সাম্প্রদায়িক শক্তির পরাজয় এবং আম আদমি পার্টির জয় আমাদের মতো মানুষদের উৎসাহিত করেছে। তবু আম আদমি পার্টির মতাদর্শগত অবস্থান প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। সেই কথাও উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু আরো বিস্তারে বলা উচিত ছিল বলে আমি মনে করি। বাজেট নিয়ে দ্বিতীয় সম্পাদকীয় এবং অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়ের নিবন্ধ আমাদের সমৃদ্ধ করেছে।

এই চিঠি লেখার তাগিদ অবশ্য অনুভব করলাম দুটি প্রবন্ধ পড়ে। খালেদ চৌধুরীর মতন মানুষের জন্মশতবর্ষে হতবাক হয়ে যেতে হয় এই কথা ভেবে যে এরকম একজন মানুষও আমাদের মধ্যে বসবাস করতেন। আমরা যারা তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানতাম না, তারা এই নিবন্ধ পড়ার মাধ্যমে এক বহুমুখী প্রতিভাধর মানুষের জীবনে উঁকি দিতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করছি। লেখককে অশেষ সাধুবাদ জানাই।

দ্বিতীয় প্রবন্ধটি অর্ক রাজপণ্ডিত রচিত পিকেটি-র বইয়ের একটি আলোচনা। লেখক বর্তমান পুঁজিবাদের সংকট, বৈষম্য নিয়ে পিকেটি-র হাত ধরে যে-ই পথে সমস্যার সমাধান খুঁজছেন, একুশ শতকের বাস্তবতায় তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তবে সুদীর্ঘ লড়াই এই প্রশ্নে লড়তে হবে।

বিপ্লব আচার্য
কলকাতা

২

অশোক মিত্রের প্রয়াণের পরেও *আরেক রকম* হাতে পাবার জন্য অধীর অপেক্ষায় থাকি। তা শুধু পত্রিকাটির রাজনৈতিক অবস্থান ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য নয়। পত্রিকটির রাজনৈতিক অবস্থান অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ যা দেশের তথা রাজ্যের নির্বোধ অসৎ ও প্রচারসর্বস্ব নেতানেত্রীদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে চলেছে। কিন্তু বড়ো কথা হল, এটি একটি যুক্তিবাদ ও জ্ঞানচর্চার অনিবার্য পত্রিকা হয়ে উঠেছে— যেখানে ইতিহাস ও আধুনিক বিজ্ঞানের স্থান বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। 'পুনঃপাঠ' বিভাগে মাঝে মাঝেই আশ্চর্য সব পুরোনো লেখা পড়ে অভিভূত হই— যেমন সম্প্রতি হয়েছি পুরোনো নাট্যজগৎ নিয়ে ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের লেখাটি পড়ে। ব্যকরণবিদ সুভাষ ভট্টাচার্যের পক্ষীবিশারদদের নিয়ে লেখাটি পড়েও অবাক হলাম।

কমলেশ ভৌমিক
কলকাতা

পুনঃপাঠ

সূর্য আমাদের প্রদক্ষিণ করতে বাধ্য?

অশোক মিত্র

আমরা রেগে কাঁই, কাশ্মীরের অধিবাসীরা সুখেস্বচ্ছন্দে আছে কি না, তাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে কি না, তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে কি না, এ-সব নিয়ে চ্যাঁচামেচি করার কী অধিকার আছে পাকিস্তানের—পাকিস্তানিদের। কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তানিদের যে-কোনো মন্তব্য ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানোর শামিল, তা আমরা কখনও হ'তে দিতে পারি না, কাশ্মীর ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, চিরকালই ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ থাকবে: দূর হঠো দুনিয়াওয়ালে, কাশ্মীর হামারা হ্যায়।

যুক্তির বিচারে না হোক, তর্কের খাতিরে যদিও মেনেও নেওয়া যায়, বাইরের কারো কাশ্মীর সম্পর্কে মন্তব্য করার এখতিয়ার নেই, কাশ্মীর একান্ত আমাদের ব্যাপার, আমরাই বুঝবো, সত্যিই কি তবে সেই-দায়িত্ব আমরা পালন করছি? গোটা কাশ্মীর উপত্যাকাকে গত কয়েক বছর ধ'রে ফৌজের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কাশ্মীর যদিও ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য, ভারতীয় সংবিধানের সাধারণ ধারাগুলির প্রয়োগ সেখানে অনেকদিন বন্ধ। আপাতত গণতন্ত্রের ছিটেফোঁটাও কাশ্মীরে অবশিষ্ট নেই। পুঞ্জীভূত গণবিক্ষোভ, যা প্রায়ই এখানে-ওখানে সর্বত্র আগুন হ'য়ে দেখা দিয়ে আঘাত হ'য়ে জ্বলছে, গুলি-বোমা-অগ্নিসংযোগ, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত শ্রীনগরে অথবা অনন্তনাগে কিংবা সোনমার্গে নয়তো পহেলগাঁওয়ে সান্ধ্যআইন বলবৎ থাকছে, পুলিশ-সৈন্যবাহিনীর তরফ থেকে বাড়ি-বাড়ি গিয়ে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। তল্লাশির নামে শোনা যায় মাঝে-মাঝে অবর্ণনীয় অত্যাচারের অনুষ্ঠান। কিছুদিন আগে সোহোর শহরে সীমান্ত পুলিশবাহিনী যে একটা গোটা পাড়ায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে দুশো-তিনশো নারী-পুরুষ-শিশুকে পুড়িয়ে মেরেছে, অসংখ্য ঘরবাড়ি পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিয়েছে, তা সরকারি বয়ানেও স্বীকৃত, সারা উপত্যাকা জুড়ে থমথমে অশান্ত অবস্থা। মাঝে-মাঝেই কাতারে-কাতারে মহিলারা বেরিয়ে এসে রাজপথে-জনপথে জমায়েৎ হ'য়ে সরকারের বিরুদ্ধে, পুলিশের বিরুদ্ধে, সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ চিৎকার ক'রে জানিয়ে আকাশ ভারি ক'রে তুলছেন, সরকারকে, পুলিশকে, টহলদারী ফৌজকে অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে অভিশাপ দিচ্ছেন। কাশ্মীরের প্রশাসন থেকেও নেই, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় মাসের পর মাস বন্ধ থাকছে। দোকানপাঠ, ব্যবসাপত্তর লাটে উঠেছে, উপত্যকার উঠতিবয়সের ছেলেদের সচারচর চোখে পড়ে না, তারা হয় কোনো বিপ্লবী সংগঠনে যোগ দিয়েছে, নয়তো পুলিশ-ফৌজের দৃষ্টি এড়াবার উদ্দেশ্যে আত্মগোপন ক'রে আছে। যদি জনমত যাচাইয়ের জন্য এই মুহূর্তে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়, এবং তাতে চুরি-জোচ্চুরি যদি হ'তে না-দেওয়া হয়, কে না জানে, গোটা কাশ্মীর উপত্যকার এক শতাংশ অধিবাসীও ভারতবর্ষের সমর্থনে তাঁদের মতদানের অধিকার প্রয়োগ করবেন না। আমাদের ধরতাইবুলিতে কাশ্মীর ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হতে পারে, কিন্তু উপস্থিত মুহূর্তে তা স্রেফ গায়ের জোরে। গণতন্ত্রের ছিটেফোঁটাও নেই কাশ্মীরে, কাশ্মীর আপাতত ভারতবর্ষের অধিকৃত অঞ্চল।

আমরা পান চিবোই, অযোধ্যাচর্চা করি, বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশে চিন্তান্বিত হই, বোম্বাই শহরে বিস্ফোরণের পিছনে কাদের-কাদের হাত তা নিয়ে গবেষণা করি, আর্যাবর্তের যে-চারটি রাজ্যে সরকার ভেঙে দেওয়া হয়েছে সেখানে কবে ফের ভোট হওয়া উচিত সে-ব্যাপারে আলোচনা-মগ্ন হই, তামিলনাড়ুতে শ্রীমতী জয়ললিতার পরবর্তী চমক কী হ'তে পারে ভেবে সারা হই, অর্থব্যবস্থা উদার হওয়ার ফলে আকাশ থেকে কী-কী সুখের পুষ্পবর্ষণের বন্যা আমাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেছে তার অঙ্ক কষি, কিন্তু কাশ্মীর প্রতিটি প্রসঙ্গের বাইরে থেকে যায়, কাশ্মীরে গণতান্ত্রিক অধিকার যে বহুবছর ধ'রে ব্যাহত তা নিয়ে মাথাব্যথা আর যারই থাকুক, আমাদের নেই, কাশ্মীরে আমাদের সৈন্যবাহিনী সন্ত্রাসদমনের নামে বীভৎস অত্যাচার করেছে কিংবা করছে কি না, তা নিয়ে আমাদের সমাজবিবেক এতটুকু উত্তেজিত নয়। হয় আমরা কূপমণ্ডূক হ'য়ে গেছি, নয় আমাদের চিন্তা শক্তি ভোঁতা হ'য়ে গেছে, নয় আমরা একপেশে যুক্তির

ছাতার তলায় নিজেদের অধিষ্ঠিত করেছি : কাশ্মীর আমাদের ছিলো, আছে, থাকবে, এ নিয়ে আর কথা বাড়ানো কেন?

ঠারে-ঠোরে, এবং প্রকাশ্যে, আরো-যা বলা হবে, কাশ্মীরে যে-অশান্তি ঘটছে তার জন্য পাকিস্তান পুরোপুরি দায়ী, স্বীকৃত সীমান্তের ওপার থেকে পাকিস্তান সরকার অনুপ্রবেশকারী পাঠাচ্ছেন ব'লেই এত গুলিগোলা-গোলমাল, এই অনুপ্রবেশকারীদের পাকিস্তানে অন্তর্ঘাতবিদ্যায় রীতিমতো তালিম দেওয়া হয়, তালিম দেওয়ার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় ঘাঁটি খোলা হয়েছে, পাকিস্তান যদি হুজ্জোতি বন্ধ করে তাহ'লেই কাশ্মীরে শান্তি প্রত্যাবর্তন করবে, ওই রাজ্যে 'রাজনৈতিক প্রক্রিয়াদি ফের শুরু করা যাবে তাহ'লে। তাছাড়া কাশ্মীরের যে-প্রধান ভূখণ্ড আমাদের কব্জায় আছে, সেখানে গণতান্ত্রিক অধিকার সুরক্ষিত আছে কি নেই তা নিয়ে পাকিস্তানিদের এত হৈ-চৈ কেন, পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরেই কি আদৌ গণতন্ত্র আছে? গণতন্ত্রের কতটুকু অবশিষ্ট সিন্ধুপ্রদেশে অথবা বালুচিস্তানে? ছেড়ে কথা কওয়ার কোনো মানে হয় না, ইন্দিরা গান্ধি না-হয় কুড়ি-বাইশ মাসের জন্য ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক রীতিনীতিকানুনপদ্ধতির অন্তর্জলীযাত্রা ঘটিয়েছিলেন, কিন্তু গোটা পাকিস্তানের মানুষজনই গণতন্ত্রের স্বাদ পেলেন কবে, ওখানে তো গত চার দশক জুড়ে স্বনামে বা বকলমে জঙ্গিশাসন, কোনো নির্বাচিত সরকারকেই টিকতে দেওয়া হয় না, এই তো ক-দিন আগে সেই নাটকেরই পুনরাবৃত্তি ঘটলো, চোরের মায়ের বড়ো গলা।

অথচ ভাবের ঘরে আর কতদিন চুরি করবো আমরা? প্রশ্নটা পাকিস্তানে গণতন্ত্র আছে কি নেই তা নিয়ে নয়, আমরা যারা গণতন্ত্রের বড়াই করি তাদের আচার-আচরণ নিয়ে। আমরা তো কাশ্মীরে গণতন্ত্র মজবুত করতে চাইছিলামই, হতচ্ছাড়া পাকিস্তানিরাই তো তা হ'তে দিচ্ছে না, এই যুক্তি বড়োই নড়বোড়ে। সেই ১৯৫৩ সালে শেখ আব্দুল্লাহ্‌কে জেলে পুরে বক্সি গোলাম মহম্মদকে দিয়ে জোড়াতালি একটা সরকার গড়ার সময় থেকে শুরু ক'রে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় প্রশাসন যে-ভুলের পাহাড় তৈরি ক'রে গেছেন, তাকে সাংবাদিকতার পরিভাষায় পাকিস্তানের 'অবদান' বলতেই হয় অতি-সামান্য, বরঞ্চ আমাদের সরকারের বিবিধ ভুলের সুযোগই পাকিস্তান সরকার গ্রহণ করেছেন। পুরোনো বৃত্তান্তগুলি না-হয় নতুন ক'রে আর উত্থাপন না-ই করা হ'লো, স্রেফ গত দশ বছরের ইতিহাস বিশ্লেষণেই অনেক জিনিস স্পষ্ট হ'য়ে আসবে। কংগ্রেসকে গো-হারান হারিয়ে ১৯৮৩ সালে ফারুক আবদুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে কাশ্মীরে ন্যাশনাল কনফারেন্সের সরকার গঠিত হ'লো, কিন্তু ধৈর্যশীল চিত্তে পরাজয় বরণ ক'রে নেওয়া কোনোদিনই ইন্দিরা গান্ধির ধাতে নেই, বছর না-ঘুরতেই তিনি ন্যাশনাল কনফারেন্সের কিছু বিধায়ককে টাকা ঢেলে কিনলেন, অতি-কুখ্যাত এক রাজ্যপাল নিযুক্ত ক'রে তাঁর মন্ত্রণায় ষড়যন্ত্রের ছক কাটা হ'লো, ফারুক আবদুল্লাহ্‌কে বিতাড়ন করা হলো। গণতন্ত্রকে টুকরো-টুকরো ক'রে ঝিলমের স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়ার অধ্যায় নতুন ক'রে সেই শুরু। যে-জনবিক্ষোভে কাশ্মীর উপত্যকা ১৯৮৪ সালে উত্তাল হ'তে দেখা গেলো, তা কোনো পাকিস্তানি অভিসন্ধি বা ষড়যন্ত্রের ফসল নয়, নতুন দিল্লিস্থ সরকারের অবিমৃষ্যকারিতা তার জন্য পুরোপুরি-দায়ী। ইন্দিরা গান্ধির পর তাঁর ছেলের জামানা, আরো এক ভয়ংকর-ভুল, অস্থিরচিত্ত ফারুক আবদুল্লাহ্‌ মুখ্যমন্ত্রিত্ব ফিরে পেতে অধৈর্য, উৎসুক, গদির লোভ দেখিয়ে রাজীব গান্ধি তাকে হাত করলেন, তাতে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ আরো ক্ষেপে গেলেন। যে-ফারুক মাত্র কয়েকমাস আগে তাদের কাছে ছিলেন মুকুটহীন রাজা, তাঁর দিক থেকে ঘৃণায় তাঁরা মুখ ফেরালেন, ফারুকের গোস্তাকির কোনো ক্ষমা নেই, যে শক্তি তাঁদের আত্মমর্যাদাকে অপমান করেছে, তার সঙ্গে যে বা যারাই নীতিরহিত বোঝাপড়ায় সম্মত হবে, সে বা তারা জীর্ণবস্ত্রের মতো পরিত্যজ্য। এখন ফারুক আবদুল্লাহ্‌কে পালিয়ে বেড়াতে হয়, বেশির ভাগ সময়ই তাঁর অবস্থান হয় লন্ডন, নয় নতুন দিল্লি, ক্বচিৎ-কখনও জম্মু শহর। কাশ্মীর উপত্যকায় পৌঁছে ওখানকার অধিবাসীদের কাছে নিজের কৃত ভুলের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করার নৈতিক তথা শারীরিক সাহস পর্যন্ত তিনি হারিয়ে ফেলেছেন।

কাশ্মীরের সঙ্গে ভারতবর্ষ নেমকহারামি করেছে, কাশ্মীরের সাধারণ মানুষের অন্তরের গভীরে এই প্রতীতি এখন শাখা-প্রশাখা ছড়িয়েছে, পাকিস্তানের কর্তাব্যক্তিরা মহামানব নন যে তার সুযোগ তাঁরা গ্রহণ করবেন না। যতই সময় গড়িয়েছে, ভারতবর্ষে ক্রমশই কাশ্মীরে গণতন্ত্র পুনঃস্থাপনের প্রসঙ্গ গৌণ হ'য়ে এসেছে। আমাদের এমনিতেই এত-এত সমস্যা, কাশ্মীর প্রসঙ্গে আর আমাদের আলাদা চিন্তা করার ফুরসৎ নেই বাপু; তাছাড়া, দেখুন তো কী অন্যায়, কাশ্মীর থেকে শত-শত সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের লোকজন বিতাড়িত হ'য়ে এসেছে, এঁদের কী উপায় হবে। এই যে গত পঁয়তাল্লিশ বছর ধ'রে কাশ্মীরকে তাঁবে রাখার জন্য লক্ষ-লক্ষ, কোটি-কোটি টাকা খরচ করেছি আমরা, তার কথাই বা ভুলি কেমন ক'রে? গণতন্ত্র শুনতে ভালো, কিন্তু ইতিমধ্যে পৃথিবীর চেহারা পালটে গেছে। সোভিয়েত রাষ্ট্র তথা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে খান্‌খান্‌, জাতিসংঘে ঋতুতে-অঋতুতে আমাদের পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ অবশিষ্ট নেই। মধ্য এশিয়া জুড়ে নতুন-গজানো ইসলামি দেশগুলির তাণ্ডব— তাজাগস্থান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, খিরগিজস্তান হ্যানো-ত্যানো— এই পরিস্থিতিতে কাশ্মীরকে আমরা হাতছাড়া হ'তে দিতে পারি না, মানবিক অধিকার-ফধিকার ছেঁদো কথা, সর্বাগ্রে জাতীয় স্বার্থ।

এখানেই মুশকিল। জাতীয় স্বার্থের সংজ্ঞা আমার-আপনার মতো ক'রে গ'ড়ে উপস্থিত বেরিয়ে যেতে পারি, কিন্তু আখেরে তাতে যে তেমন-কিছু সুবিধার সম্ভাবনা তা মনে হয় না। ইংরেজরা ভারত সাম্রাজ্য একদা স্থাপন করেছিলেন, সেই সাম্রাজ্য থেকে তাঁরা অপসৃতও হয়েছিলেন ইতিহাসের নিয়মে, অথচ আমাদের প্রশাসনের যাঁরা হাল ধ'রে আছেন, তাঁদের চেতনা জুড়ে একটি বিভঙ্গ : ইংরেজরা গেছেন তো হয়েছে কী, তাঁদের একদা-স্থাপিত সাম্রাজ্যের প্রতিভূ আমরা; ইংরেজদের যেমন মান্য ক'রে চলা হ'তো, আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যগুলির ধর্মীয় কর্তব্য আমাদেরও অনুরূপ মান্য ক'রে চলা। শুধু কাশ্মীর বা পাকিস্তান নিয়েই জটিলতা নয়, অন্যান্য পড়শিদের সঙ্গেও আমাদের সমস্যার শেষ নেই। এত কাঠখড় পুড়িয়ে বাংলাদেশকে আমরা স্বাধীন ক'রে দিলাম, কিন্তু বিন্দুতম কৃতজ্ঞতাবোধ নেই ওদের, এই ছুতোয়-ওই ছুতোয় আমাদের পিছনে কাঠি দিচ্ছে। নেপাল হিন্দু রাষ্ট্র, অথচ সেখানেও প্রায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল ভারতবর্ষের প্রতি বিদ্বিষ্ট : ওই দেশের প্রশাসনের একটি বড়ো অংশ আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, চিনের সঙে কী সব ফুসুর-ফাসুর করছে সব সময়। শ্রীলঙ্কার লোকদের কথা না-বলাই ভালো : কী কারণে যেন ওরা আমাদের আদৌ দেখতে পারে না, অথচ বৌদ্ধ পীঠস্থানগুলি সবই ভারতবর্ষে, ওদের এ-দেশে না-এসে উপায় নেই; হয়তো সে-কারণেই আমাদের উপর রাগ। আপাতত শ্রীলঙার সরকার ওঁদের ওখানে তামিলদের ধোলাই দিচ্ছেন, রাজীব গান্ধির কথা শোনেনি ব'লে আমরাও তামিলদের রগড়ে দিয়েছি, এই মুহূর্তে তাই কলম্বোর রাজপুরুষরা আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিদিন বিবৃতি দেওয়া বন্ধ রেখেছেন, তবে, এটা হয়তো সাময়িক অবস্থা, শিগগিরই ফের কোনো ছুতোয় আমাদের বাড়া ভাতে ছাই দিতে শুরু করবে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র ভুটান আর মালদ্বীপকে আমরা কোনোক্রমে বাগে রাখতে সফল হয়েছি, তা-ও অনেক টাকা অনুদান দিতে হয় ওদের। নগদ টাকায় বশ্যতা কেনা আর কি, তাতে তেমন আত্মপ্রসাদবোধ নেই।

পড়শি রাষ্ট্রগুলি কেন আমাদের পছন্দ করে না, সে-ব্যাপারে আমাদের দেশে কিন্তু তেমন আলোচনা বা উদ্বেগ লক্ষ্য হয় না। আমাদের সাফল্যে ওরা সবাই জ্ব'লে-পুড়ে মরছে, এই ব্যাখ্যা বড়ো সরলীকৃত, বড়ো একপেশে। আমরা সবাই ভালো আর ওরা সবাই কহতব্য নয়, এটা তো কোনো বিশ্লেষণ নয়, প্রায়-নিরক্ষর আত্মম্ভরিতা। আমাদের প্রতিবেশীরা কেউই নির্গুণ ব্রহ্ম নন, তাঁদের মধ্যে হাজার ত্রুটি-বিচ্যুতি অবশ্যই চোখে পড়ে, কুচুটেপনায়ও কেউ-কেউ কম যান না। তবে, আমাদের সমালোচনায় তাঁরা যা-যা বলেন সেগুলিও তো উপেক্ষণীয় নয়। আমাদের মধ্যে বিনয়ের অভাব, তিলকে আমরা তাল ক'রে বলি, পড়শিদের আমরা তুচ্ছাতিতুচ্ছ জ্ঞান করি, প্রতিবেশীদের সমস্যাগুলি আদপে বোঝবারই চেষ্টা করি না, আমাদের কাছে যে-সিদ্ধান্ত স্বতঃসিদ্ধ ব'লে মনে হয় তাই-ই জোর ক'রে ওদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ওভাবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ধ্বংস ক'রে ফেলা হ'লো, দেশের সরকার কার্যত দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলেন, তা থেকেও যে প্রতিটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রে বিবমিষার সঞ্চার হয়েছে, এখন পর্যন্ত আমরা অনুধাবন করতে অসমর্থ। এমন নয় যে পৃথিবীতে কদাপি কখনও ধর্মস্থান ধ্বংস করা হয়নি। কিন্তু ভারতবর্ষে যা ঘটছে এক হিসেবে তা তুলনা-প্রতিতুলনার বাইরে। ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ব'লে খ্যাত, এবং জাতীয় সরকার কড়া-কড়া অনেক পূর্বঘোষণা করেছিলেন আইনবহির্ভূত কোনো অপকর্ম করতে দেওয়া হবে না, দেশের সর্বোচ্চ আদালত থেকেও তদনুরূপ আদেশ দেওয়া হয়েছিলো, তৎসত্ত্বেও সরকার মসজিদ ভাঙবার মুহূর্তে কোনো বাধা দিলেন না, গোটা পৃথিবী জুড়ে এখন আমাদের নামে ঢিঢিক্কার।

এত সব সমালোচনার ঠেলায় আমাদের মধ্যে কারো-কারো প্রথম-প্রথম উষ্মার সঞ্চার হ'তে পারে, আমরা নির্জীব ঢোঁড়া সাপ নই, প্রায় নব্বুই কোটি জনসংখ্যামণ্ডিত অজগর, যে যা বলুক আমাদের নিয়ে, কিচ্ছু যায়-আসে না। মুশকিল হ'লো আমাদের সরকার অর্থনীতির খোলনলচে পরিবর্তন করেছেন গত কয়েক বছরে, আর্থিক স্বয়ংভরতার লক্ষ্য বিসর্জন দিয়েছেন, অর্থব্যবস্থাকে সর্ববিধ নিয়ন্ত্রণমুক্ত করেছেন, ফলে, বিদেশীদের উপর নির্ভরতা আমাদের বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কাশ্মীর বা বাবরি মসজিদ নিয়ে কাছের বা দূরের প্রতিবেশীরা কী বলাবলি করছে তা তাই ঠিক উপেক্ষা করা চলে না। দেশে-দেশে এখন মানবাধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে বহু সংস্থা গঠিত হয়েছে, তারা অত্যন্ত সোচ্চার, ভারতবর্ষের সরকারকে তারা ছেড়ে কথা কইবে না, ভারতবর্ষের সরকার কাশ্মীর কিংবা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে তাদের অনুযোগ কান না-পাতলে তারা হয়তো তাদের নিজেদের দেশের সরকারের উপর চাপ দেবে : ভারতবর্ষের সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা বন্ধ করুন, ভারতবর্ষকে সর্বপ্রকার সাহায্য দেওয়া স্থগিত রাখুন। বিদেশীদের কাছে হাত পেতে ঋণগ্রহণ করবো, কিন্তু তাদের হিতোপদেশ শুনবো না, এই বৈপরীত্য মেলানো বর্তমান পৃথিবীতে সম্ভব নয়। আমাদের তাই হয়তো গভীর গাড্ডা।

অশোক মিত্রের সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ *তাল-বেতাল* (দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৪) থেকে প্রবন্ধটি নেওয়া হল।

LIFE BEGINS AT 60!

JAGRITI DHAM

KOLKATA'S MOST COMPREHENSIVE HOME FOR SENIOR LIVING

SAFETY ACTIVITY COMMUNITY SPIRITUALITY

Yoga & meditation

Wellness spa

Indoor games

Privilege access to IBIZA Club

24 x 7 Medical care

Mandir

ROOMS

- Furnished and fully-serviced AC rooms
- TV, balcony, attached toilet and pantry
- Housekeeping and maintenance on call
- Wi-fi, Intercom

SENIOR-FRIENDLY ARCHITECTURE

- Wheel chair and walker-enabled spaces and ramps
- Spacious lifts to accommodate stretchers
- Specially designed bathrooms with wheel chair-accessible showers

SECURITY

- 24 hours manned gate with intercom
- Electronic surveillance, CCTV
- Power back-up

HEALTHCARE

- 24 x 7 ambulance, attendant, emergency healthcare
- Visiting doctors, specialists-on-call
- Emergency button in every room and frequently occupied areas
- Tie-ups with the city's best nursing homes and hospitals

- Inside Merlin Greens complex
- Adjacent to Ibiza on Diamond Harbour Road
- Near Bharat Sevasram Hospital and Swaminarayan Dham Temple
- 5 kms from Nature Cure and Yoga Research Institute

+91 88 200 22022 | Merlin Greens, IBIZA Club, Diamond Harbour Road, Pin 743 503

contact@jagritidham.com | www.jagritidham.com

Issue date 1 March 2020. Registered No. KOL RMS/455/2019-2021
Registered with the RNI NO. WBBEN/2013/49896.
Vol. 8, Issue 5 Arek Rakam

ISO 9001:2008

NIGHTINGALE HOSPITAL

11, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071
Phone : 2282-7465 / 7462 / 7969 - 72
Doctors Booking (10.00 a.m. to 6.00 p.m.)
98743 26662 / 98743 76667
Fax : 00-91-33-2282-6454
E-mail : feedback@nightingalehospital.com
Website : www.nightingalehospital.com

Published by Trishitananda Roy on behalf of Samaj Charcha Trust from 3rd Floor, 39A/1A, Bosepukur Road, Kolkata–700 042 and printed by him at S. P. Communications Pvt. Ltd., 31B Raja Dinendra Street, Kolkata–700 009.

Rs. 30